তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাক্-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রথম পর্ব

এক

আজকের নয়, অর্থাৎ ১৯৬০ সালের নয়; উনিশ কুড়ি বছর আগের, ১৯৪২ সালের ঘটনা। বর্ধমানের নামকরা কীর্তনওয়ালী কাঞ্চনমালা নিঃস্ব অবস্থায় প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা গেল। প্রথম ছিল দেহ-ব্যবসায়িনী খেমটাওয়ালী—তারপর হয়েছিল কীর্তন-গায়িকা। বড় বড় আসরে সে কীর্তন গান করে অনেক খ্যাতি অর্জন করেছিল। গ্রামোফোন রেকর্ডে তার গানও উঠেছিল—সে গান আজও কখনও সখনও শোনা যায়।

পাশে বসে কাঁদছিল তার মেয়ে—নাম মুক্তামালা, ডাকনাম মুক্তো। সুন্দরী মেয়ে; তার সৌন্দর্যের কেন্দ্রবিন্দু একটি নয়, দুটি, দুটি চোখ। তের চৌদ্দ বছর বয়স—কিন্তু তার ওই চোখ যেন বলে দেয় সে আজও শিশু, মনের দিক থেকে বাড়েনি; এবং ওই চোখ দুটি দেখেই মানুষের মন স্নেহে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। মায়ের পাশে একটি পা মাটির উপর ভেঁজে অন্য পাখানি উঁচু করে ভেঁজে সেই হাঁটুর উপর মাথা রেখে নীরবে কাঁদছিল। কোন ভাষা বা রব তো ছিলই না—বারেকের জন্যেও সে ফোঁপায় নি, শুধু চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছিল হাঁটুর উপর—এক চোখের ধারা কাত-করা মুখের জন্য নাকের ডগা বেয়ে মাটিতে পড়ছিল টোপায় টোপায়।

কাঞ্চন কীর্তনওয়ালীর জ্ঞান ছিল টনটনে। ক্ষয়-রোগের রোগী; আস্থিক ক্ষয়রোগ। প্রথমটা হয়েছিল পায়ের হাড়ে; ডাক্তারেরা বলেছিলেন টি বি অব বোন্‌স্; কলকাতার মেডিকেল কলেজের ডাক্তারেরা পাখানা হাঁটুর নিচে থেকে কেটে দিতে চেয়েছিলেন—কিন্তু তাতে কাঞ্চনমালা রাজী হয়নি। আলট্রা-ভায়লেট রে দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছিল—তাতে ফল হয়নি—তারপর করেছিল হোমিওপ্যাথি; সেও যখন নিস্ফল হল তখন ক্ষতের চিকিৎসাটাকে বড় করে চাঁদসীর শরণাপন্ন হয়েছিল। চাঁদসীর চিকিৎসায় ক্ষতের মুখটা প্রায় বন্ধ হয়ে এল, কিন্তু ক্ষয়রোগ তার আক্রমণ স্থানান্তরিত করলে পেটে। দেড় বৎসর রোগভোগ। শরীর শীর্ণ হয়ে বিছানার সঙ্গে মিলিয়ে যাবার মত হয়েছিল, কিন্তু জ্ঞান বুদ্ধি ছিল সমান সতেজ। বয়স কাঞ্চনমালার বেশী হয়নি—বছর সাঁইত্রিশ আটত্রিশ। সে কয়েকদিন ধরেই বেশ বুঝছে দিন তার বেশী নেই—বোধ করি সেই কারণেই কীর্তনগায়িকা কাঞ্চন তার বিশ্বাসমত নাম করে যাচ্ছে—গোবিন্দের।

ক'দিন ধরে এর আগে মুক্তামালাকে বলেছে তার নিজের জীবনের কথা। শুধু তাইই বলে নি, বলেছে—এই সাঁইত্রিশ আটত্রিশ বছরের জীবনে সে কত দেখেছে, বলেছে—যা দেখেছে তা তার জীবনের ঘটনা থেকেও বিচিত্র। আর ভাগ্যক্রমে গুরুর কৃপায় যা পেয়েছে তা আবার যা দেখেছে তা থেকেও অপরূপ। তাই তার আজ আর কোন খেদ নেই।—মুক্তো রে, খেদ নেই আমার, কোন খেদ নেই। তোকে রেখে যাচ্ছি তাতেও খেদ নেই; ভয় নেই—কোন ভয় নেই। তবে—

চুপ করে ছিল কিছুক্ষণের জন্য। তারপর বলেছিল—ওরে ভয় হচ্ছে কালের জন্য। কালের এমন চেহারা কখনও দেখিনি; শুনি নি; ভাবি নি। ওঃ! যেন সেই কালের স্বরূপ মনে মনে প্রত্যক্ষ করে সে ওঃ বলে শিউরে উঠল!

সে যেন চোখে দেখলে—১৯৪২ সালে—কাল থেকে কালান্তরে পদক্ষেপের লগ্নে তাণ্ডবছন্দে শূন্যলোকে ললিতবঙ্কিম ভঙ্গিমায় শূন্যে উত্তোলিত দক্ষিণপাদ মহাকাল নিমীলিত রক্তিম বামচক্ষু মেলে চেয়ে রয়েছেন সম্মুখের দিকে। দক্ষিণপাদ শূন্যলোকে উত্তোলিত—বামপদখানি বর্তমান কালে স্থিত—কিন্তু আনন্দসুধা প্রমত্ততায় অস্থির। টলছে—নিজে যেন ঢুলছেন ভারসাম্য রক্ষা করতে। তাতে পৃথিবী কাঁপছে; শূন্যলোকে তাণ্ডবের ছন্দ জেগেছে, সেই ছন্দে এসেছে আশ্বিনের সাইক্লোন; পিছনে পিছনে এসেছে মহামারী; প্রাণজগতের চৈতন্য লোকেও বেজে উঠেছে তাঁর হাতের ডমরুধ্বনি। প্রতিধ্বনির মত মানুষ বাজিয়েছে রণবাদ্য। নীলকণ্ঠের কণ্ঠগরলের মত্ততার ছোঁয়াচে মরণে তার নেশা লেগেছে, মরণে তার উল্লাস জেগেছে। মহাকালের হাতের আগুন থেকে আগুন সংগ্রহ করে পৃথিবীর বুকে শূন্যলোকে আগুন লাগিয়ে সেও নাচতে শুরু করেছে। জীবন হয়েছে তুবড়ির আগুনের ফোয়ারার মুখের ফুলকির মত। মুহূর্তের জন্য ঝকমকিয়ে জ্বলেই নিভে যাচ্ছে।

বড় বড় জমিদার—ভূসম্পত্তিবানেদের বাড়ি ফাটছে—যার ফাটে নি তার বাড়িতে নোনা ধরেছে, শ্যাওলা পড়েছে। ব্যবসায়ীরা ফাঁপছে। আবার দু চারজন রাতারাতি ফকির হচ্ছে। তাদের শূন্য স্থান পূর্ণ করে রাতারাতি দু চারজন পথের মানুষ লক্ষপতি হয়ে ব্যবসা ফেঁদে বসছে। মধ্যবিত্তেরা সব হারাচ্ছে। গরীবেরা পথে পড়ে মরছে। তার নিজের জীবন? শুধু তার নিজের নয়—তাদের—মানে সমস্ত বারবিলাসিনীদের সমাজজীবন? সে নিজে অবশ্য এদের থেকে খানিকটা—খানিকটা কেন—অনেকটাই পৃথক; তবু তার জীবনে তার আঘাত কম লাগে নি, বরং বেশী লেগেছে।

ওঃ—সে কত কথা, কত বিচিত্র কথা!

তার প্রথম জীবনে,—কত বয়স তখন? সাত আট—তখন

দেখেছে কলকাতা, বর্ধমান, সিউড়ি, বহরমপুর, পূর্ববঙ্গে ঢাকা, ময়মনসিং, রাজসাহী, রংপুর বড় বড় শহরে, এ দেশের গ্রামের জমিদার বাড়িতে, ঝরিয়া রানীগঞ্জে কলিয়ারীতে—কত বায়না ; খেমটা নাচের আসর বসত। কত প্যালা পড়ত। ঝাড়লণ্ঠন, ঘোড়া, হাতী, বজরা—সে সব কত ব্যাপার! সে সব কত গান! সন্ধ্যার আসরে একরকম গান, রাত্রি বারোটার পর আর একরকম গান। সে তার মায়ের আমল। মা খ্যামটা নাচত—কীর্তনও গাইত। বিয়ে সাদী অন্নপ্রাশন—এমন কি ব্রাহ্মণ জমিদার বাড়িতে ছেলের পৈতেতেও খ্যামটা নাচ হয়েছে। মা বলে—কোথাকার ইস্কুল প্রতিষ্ঠার সময়—সাহেবদের দেখাবার জন্যে—খ্যামটা নাচের ব্যবস্থা হয়েছিল—তার মায়ের তখনও সন্তান হয় নি—সে সেই আসরে নেচে এসেছিল।

আবার এই সব বাবুদের বাড়িতে—রাসে দোলে ঝুলনে ঢপ-কীর্তনের আসর হত। ওরই মধ্যে একদিন ঢপওয়ালীরাই খ্যামটা নাচত। শ্রাদ্ধে ঢপ-কীর্তন হত—তখন আর খ্যামটার আসর বসতনা। কলকাতায় বাগানবাড়ি ছিল। এতে জমিদার, ব্যবসাদার, উকিল, ব্যারিস্টার, ডাক্তার—সব জাতের মানুষের আনাগোনা। সে নিজেও বাগান-বাড়ি দেখেছে, না-দেখা নয়। সে সব আবু-হোসেনি কাণ্ড। সে আলিবাবা নাটকে থিয়েটারে পার্টও করেছে। ওঃ! ওই নাটকে পার্ট করতে গিয়েই জীবনের মোড় ফিরল তার।

সে উনিশশো একুশ সাল। দেশে গান্ধী মহারাজ জেগেছেন। তাঁর নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলন হচ্ছে। দেশের মোড় ফিরল। যে ঢেউ বা যে জোয়ার বইছিল তাদের সমাজে তাতে ভাটা পড়ল। সেই ভাটার টান ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। তাদের সমাজে, জীবনে চড়া পড়েছে, বালি জেগেছে। নাচগানের আসরের চেহারা পাল্টাতে শুরু করলে। আজ এমন পাল্টেছে যে তাতে আর তাদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। ভদ্র ঘরের মেয়েরা লেখাপড়ার সঙ্গে নাচগান শিখে আসরের সঙ্গে

নাচগানের ঢং পাল্টে দিয়েছে। এবং বাড়িতে বায়না করে নাচগান শোনার রেওয়াজ উঠে গিয়ে থিয়েটার হলে টিকিট বিক্রি করে নাচ-গানের দিন এসেছে। বায়নাও আছে—নেই এমন নয়, সেও সভা হয়, সেই সভায় নাচিয়ে গাইয়েরা যায়—তুখানা চারখান গান গেয়ে, এক বা তুদফা নেচে টাকা নিয়ে চলে আসে। বড়লোকের রক্ষিতা রাখার রেওয়াজ অবশ্য পালটায়নি, তবে তারও ধরন বদলেছে। এই বদলের মধ্যে মার খেয়েছে সে বেশী। কারণ কীর্তন, শ্যামাসংগীত এসব প্রায় উঠেই গেল। কীর্তন থাকলেও ঢপ-কীর্তন কেউ শোনে না। পান্না দাসী, বেদানা দাসী গেছে—তাদের পথ ধরে কাঞ্চনমালাও যাচ্ছে, যাচ্ছে, কেন সেও গিয়েছে। তাতে তার খেদ নেই। কোন খেদ নেই। খেদ তার অনেক দিন ঘুচে গেছে। না-হলে এই যুবতী সুন্দরী মেয়ে মুক্তামালা মূলধন থাকতে তাকে বিনা চিকিৎসায় মরতে হত না। তা হোক—বিনা চিকিৎসায় সে মরুক—সে মুক্তামালাকে মূলধন করে তার দেহ বিক্রির টাকায় চিকিৎসা করিয়ে বাঁচতে চায় না; তার থেকে এ মৃত্যু তার মুক্তি। সে কি তাই পারে? তার গুরু তাকে তুটি দান দিয়ে গেছেন। ওই মুক্তামালা আর গোবিন্দভক্তি। পঙ্কের মধ্যে তার যে জীবন চাপা পড়েছিল তাকে তিনি পঙ্কজের মত ফুটিয়ে তুলেছেন।

কলকাতার রামবাগানে তার জন্ম। তার মা ছিল ব্রাহ্মণকন্যা, বালবিধবা। অদৃষ্টচক্রে বল অদৃষ্টচক্রে, অথবা নিজের ভুলে কুলত্যাগ করে এসে অবশেষে আশ্রয় নিয়েছিল রামবাগানে। মায়ের রূপ ছিল। নাচগান জানত না। ওই দেহের কারবারের ফল হিসেবে সে এসেছিল মায়ের কোলে। সে একা নয়, আরও একটি মেয়ে—তার আর এক বোন—চাঁপা—চম্পকমালা। সে বড়, চাঁপা ছোট। চৌদ্দ পনের বছর থেকেই মা তাকে নিয়ে শুরু করেছিল ব্যবসা। চাঁপা তখনও ছোট---এগার বারো বছর বয়স। তখন প্রথমবার যুদ্ধ

লেগেছে—এই জার্মানী আর ইংলণ্ডে। মাড়োয়ারী আর বাঙালী ব্যবসাদাররা বাগানবাড়িতে মেতেছে। এদিকে হাওড়া থেকে শ্রীরামপুর পর্যন্ত, ওদিকে খড়দ' পর্যন্ত বাগানবাড়ি ছিল অনেক। শনিবার তারা সেখানে যেত—খাবারদাবার, মদ, পান, গোলাপজল সঙ্গে যেত—আর তাদের সমাজের দুজন চারজন মেয়ে। রবিবার রাত্রি দশটায় বা সোমবার ভোর ভোর ফিরত। অন্যবারে—সোম থেকে শুক্র পর্যন্ত তাদের রামবাগানের বাসায় চলত ব্যবসা। তার রূপের মোহে পড়েছিল এক বাঙালীবাবু। সে তাকে আলাদা ঘর ভাড়া করে বছর তিনেক রেখেছিল—এবং সেই তাকে শিখিয়েছিল গানবাজনা—নাচ। ওস্তাদ রেখে দিয়েছিল। তিন বছর পর তাকে সেই বাবুই ঢুকিয়েছিল থিয়েটারে। সখীর দলে নাচত। অভিনয়ের দিন বাবু বসে থাকত সামনে—ফুলের তোড়া হাতে। সে স্টেজে বের হলে সেই তোড়া ছুড়ে দিত। তারপর থিয়েটার শেষ হলে বাড়ির ঘোড়ার গাড়িতে বাবুর সঙ্গে ফিরত বাসায়। তিন বছর পর সেই বাবুই তাকে ছেড়ে পড়ল চাঁপাকে নিয়ে। তাতে তার খুব আক্ষেপ ছিল না, কারণ ওই বাবুর এক বন্ধু তাকে নিয়ে বাসা বদলেছিল। তারপর সে হয়েছিল স্বাধীন। স্বেচ্ছাচারিণী। থিয়েটারে প্রেমিক কম জোটে নি। সে তখন সব থেকে ঝলমলে ফুল থিয়েটারের মধ্যে। চাঁপাও তখন থিয়েটারে ঢুকেছে। তারও নাম হচ্ছে। হঠাৎ এল জীবনের গতি-পরিবর্তন। আলিবাবা বই খুলেছিল বড় দিনের বাজারে। তখন বলত বড়দিনের বাজার। নানা জায়গা থেকে কলকাতায় আসত বড়লোকের দল। দিল্লী থেকে বড়লাটের সঙ্গে রাজা, মহারাজা, জমিদার, ব্যবসাদার থেকে সাধারণ লোক পর্যন্ত। ময়দানে সার্কাসের তাঁবু পড়ত, থিয়েটারে থিয়েটারে নতুন বই খুলত। নাচগানের বই, অপেরার ওপর বেশী ঝোঁক ছিল। সেবার ভাল নতুন অপেরার অভাবে পুরনো আলিবাবা খুলেছিল তাদের থিয়েটার, সে পেয়েছিল

মর্জিনার পার্ট। আবদালার পার্ট করেছিল—বিখ্যাত ড্যান্সিং মাস্টার অ্যাক্টর নণ্টু মাস্টার। সেদিন থিয়েটারে ঠাসা বিক্রী। গোটা সামনের সারিটায় বসেছিল একদল কালো মানুষ। সঙ্গে তাদের রাশি রাশি ফুল। থিয়েটারের ম্যানেজার—মালিক—দুপাশে দাঁড়িয়ে তটস্থ হয়ে তাদের কখন কি দরকার দেখছে। স্টেজের ভিতরে গুঞ্জন উঠছিল—লালপাহাড়ীর রাজা এবং কুমার এসেছেন। সঙ্গে জন তিরিশেক পারিষদ। তাঁদের সঙ্গে জন পঁচিশেক কয়লার ব্যবসাদার। লালপাহাড়ীর রাজা বন-পাহাড় অঞ্চলের রাজা। তাঁর এলাকাটা কয়লায় ভরতি। কয়লার জমির মালিক হিসেবে লাখে লাখে টাকা আসে তাঁদের। বিশ পঁচিশ ত্রিশ লাখ। উজ্জ্বল পোষাক আর দুহাতে আটটা আংটি—কানে মুক্তো হীরের টপ্—গায়ের সেন্টের গন্ধে গোটা হাউসটা প্রতিমুহূর্তে তাঁদের উপস্থিতি অনুভব করছিল। আর সে কি উল্লাস! কি হাততালি! কত এনকোর, একসেলেন্ট, বাহবা, বহুতাচ্ছা চীৎকার! তার পায়ের কাছে ঝুড়ি দুই তিন ফুল পড়েছিল। তার ইচ্ছে হয়েছিল 'ছি ছি এত্তা জঞ্জাল' গানখানা বার বার গাইতে। "বার বার লাগাতা ঝাড়ু তবভি এইসা হাল।" মনে বলেছিল তাই বটে। প্লে শেষ হয় হয়—সে গ্রীনরুমে বসেই খবর পেয়েছিল রাজা আর কুমার তার ঠিকানা লিখে নিয়েছেন। সে মুখ মিচকে হেসেছিল। মরণ! রাজা আর কুমার একসঙ্গে? যে খবর এনেছিল সে বলেছিল—রাজা কুমার বাপ বেটা নয়, খুড়ো ভাইপো। বছর দু তিনের ছোটবড়। সব ওদের একসঙ্গে। পাপ পুণ্য, ভালো মন্দ সব। তীর্থ থেকে তাদের আলয় পর্যন্ত একসঙ্গে যাত্রা! কথাটা সত্যি। সেদিন থিয়েটারের অফ ডে। বাড়ির দরজায় মোটর এসে দাঁড়াল। তখন ১৯২০ সাল। মোটর দেশে এলেও দু দশখানা। কয়লার পয়সায় রাজা কুমার নতুন মোটর কিনেছেন সেই দিন। সেই মোটরে চেপে প্রথম এসেছেন তার দরজায়।

তারপর সারারাত মাইফেল। রাজা কুমারেরা জন পাঁচেক; সুতরাং আরও সখীর প্রয়োজন হয়েছিল। তার মায়ের ব্যবস্থায় চাঁপা এসেছিল—এবং আরও তিনজন—তাদের ওরাই এনেছিল বাছাই করে। সে পড়েছিল কুমারের নজরে। কুমারের খাতির রাজার থেকে বেশী। সম্পর্কে সেই খুড়ো। তার দুদিন পর কুমার আর রাজা দুজনে এসেছিলেন, সঙ্গে একজন পারিষদ। উপঢৌকন দিয়েছিলেন হীরের দুল—তাকে শুধু নয়, চাঁপাকেও। এবং মোটরে চড়িয়ে হাওয়া খেয়ে ফিরবার সময় ফারের ওভারকোট এবং জিরো পাওয়ার সোনার চশমা কিনে পরিয়ে একেবারে বিবি সাজিয়ে দিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরেই মায়ের কাছে প্রস্তাব করেছিলেন—তাকে আর চাঁপাকে খুড়ো ভাইপোতে লালপাহাড়ী নিয়ে যেতে চান; স্থায়ীভাবে। পাকা বাড়ি—বছরে ছ হাজার টাকা তনখা—চাকর ঠাকুর দারোয়ান—খাইখরচ—এসব আলাদা। অগ্রিম পাঁচ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা করে দেবে—যার নামে তারা চায় তার নামে। মায়ের নামে বলে মায়ের নামে, মেয়েদের নামে নামে বলে তাই। এ ছাড়া গয়নাগাঁটি যা দেবে—তা দেবে। তার সঙ্গে ওই ছ হাজারের কোন সম্পর্ক নেই। কাপড়চোপড়—সায়া ব্লাউজ বডিস এসব তো আছেই। মা সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়েছিল—ছ ছ হাজার—দুই মেয়ের বারো হাজার—এ যে এক জায়গীর। এ কি ছাড়া যায়! এরপর রাজা কুমারকে খুশী করে তাদের মোহিনী মায়ার ফাঁদে ফেলে কলকাতায় বাড়ি করিয়ে নিতে কতদিন লাগবে! টাকাটা দশ হাজার মায়ের নামেই ব্যাঙ্কে জমা হয়েছিল। এবং তারা মাসখানেকের মধ্যেই লালপাহাড়ীর বাগানবাড়িতে গিয়ে বাস করতে শুরু করেছিল! সত্যই সে রাজার ঐশ্বর্য। এরা সব পুরনো কালের বনদেশের রাজা। সে আমলে এসব বাড়ি ঘর ঐশ্বর্য কিছুই ছিল না বাড়ি ছিল খাপরার চালের। চালচলন ছিল মোটামুটি। নতুন ইংরেজের আমল আর

মাটির তলা থেকে কয়লা বের হতে এরা হয়ে পড়ল অতুল ঐশ্বর্য আর বিপুল বিলাসের মালিক। কলকাতা শহরে যে ঐশ্বর্য যে বিলাস তার কিছুর অভাব রাখেন নি রাজাসাহেব আর কুমারসাহেব। শালবনের মধ্যে বাগান তৈরি করে তার মধ্যে ছোট দোতলা প্রাসাদ। পাশে ঝিল, তাতে সুন্দর নৌকো। ইলেকট্রিক লাইট, দামী ভারী পর্দা, মেঝেতে কার্পেট, সোফা কুশন—তেমনি বাথরুম। মধ্যে বড় হলে নাচগানের আসর! ঝি চাকর দারোয়ান। বছর তিনেক এখানে কেটেছিল। রাত্রে কুমারসাহেবের আসর বসত। প্রথমে গানবাজনা; তারপর মদ; তারপর বিলাসের পাশবিকতা। বাগান থেকে ঝিলে নৌকোয় লুকোচুরি খেলা থেকে অনেক কিছু। তারপর মধ্যরাত্রি পার করে কুমারসাহেব চাকরের কাঁধে ভর দিয়ে গাড়িতে উঠতেন—বাড়ি ফিরতেন। কোন কোন দিন এখানেই থেকে যেতেন। সকাল হত বেলা নটায়। তারপর প্রাতঃকৃত্য সেরে একদফা ওস্তাদের কাছে গান শিখত। কুমারসাহেব লোকটা তাদের সমশ্রেণীর মত দেহসর্বস্ব পাশবিক চরিত্রের হলেও একটা কোমলবৃত্তি ছিল। লোকটার গানে শখ ছিল। গান শেখার প্রথম পর্ব শেষ করে দুপুরে একটার পর স্নান খাওয়া সেরে আসত একটি ঘুমের পালা; বিকেলে পাঁচটায় উঠে গা ধুয়ে প্রসাধন সেরে সন্ধ্যায় আবার বসত ওস্তাদকে নিয়ে। যতক্ষণ কুমারসাহেব না-আসতেন ততক্ষণ চলত। কুমার এসে বসতেই সে গান ছেড়ে গ্লাস পূর্ণ করে কুমারসাহেবের হাতে তুলে দিত। কুমারসাহেব বলতেন—আন—। অর্থাৎ বোতল গ্লাস। আর একটা গ্লাস ভ'রে সেটি তার হাতে তুলে দিত।—পিয়ো!

গ্লাসে গ্লাসে ঠেকিয়ে পানের পর্ব শুরু হত। খাবারের থালা চাকরে—না চাকর নয়—বয়, বয় সাজিয়েই রাখত,—তারা সেটা টেনে নিত।

চাঁপার বাগান বাসা ছিল আলাদা। বেশ খানিকটা দূর। মধ্যে

মধ্যে দুপুরে চাঁপা আসত, নয়তো কাঞ্চন যেত; কখনও কখনও রাজাসাহেব নিমন্ত্রণ করলে কুমারসাহেব কাঞ্চনকে নিয়ে যেতেন। কখনও তার ওখান থেকে কুমারসাহেবের নিমন্ত্রণ যেত রাজাসাহেবের বাগানে চাঁপার বাসায়। গানবাজনা খাওয়াদাওয়া সেরে তারা চলে যেত। গানবাজনায় রাজাসাহেবের শখ ছিল না—চাঁপার নিজেরও না। ওস্তাদ একজন ছিল, সে থাকতে হয় বলে ছিল। ওরা দুজনেই ছিল স্থূলদেহসর্বস্ব। শুধু তাই নয়, রুচিটাও ছিল বড় নিচু। কুৎসিত। রাজার একটা শখ ছিল শিকার। শিকারে চাঁপাও যেত। বন্দুক ছুড়তেও শিখেছিল। আরও অনেক কিছু শিখেছিল। রাজার মদে নেশা হত না। কোকেন খেত। চাঁপাও শিখেছিল। যাক—সে হতভাগীর কথা যাক।

তিন বছর পর ওখানেই তার অদৃষ্টক্রমে সে পেলে তার গুরুকে।

লালপাহাড়ীর রাজবাড়ি। রাজারা ওদেশের মানুষদের মত ঘোর ঘন কৃষ্ণাঙ্গ হলেও জাতিতে ছিল ক্ষত্রিয়। বাড়িতে ঠাকুর ছিল। এবং ঠাকুরকে উপলক্ষ্য করে উৎসব হত। বড় বড় উৎসব। সে সব একটা বিরাট সমারোহ। কলকাতার যাত্রা—কখনও থিয়েটার, নামকরা বাঈজী, খেমটা, বড় বড় গাইয়ের জলসা। সারা রাজ্য জুড়ে কয়লার কুঠিতে কুঠিতে নিমন্ত্রণ। সাহেব থেকে বাঙালী, কাচ্ছি, মারোয়াড়ী, হিন্দুস্থানী কুঠির মালিক ম্যানেজারদের উপস্থিতি ছিল প্রায় বাধ্যতামূলক। না-এলে কৈফিয়ত লাগত। কলকাতা থেকে উকীল ব্যারিস্টার অ্যাটর্নীরা আসত; দু চারজন নামকরা লোকও আসত। পাটনা থেকে আসত। সরকারী কর্মচারীরা আসত। সমারোহের দুটো ভাগ ছিল। আর একটা ভাগে বসত কবির পাল্লা—ঝুমুর নাচ—সাধারণ যাত্রার আসর। এসব ছিল স্থানীয় লোকদের জন্য। গোটা লালপাহাড়ী শহরটায় দশ পনের দিন ধরে

দিনেরাত্রে মানুষের প্রায় বিশ্রাম থাকত না। রাত্রে ঝলমল করত আলোয়।

লালপাহাড়ীর রাজা বলতেন অহংকার করে—লালপাহাড়ী শহর হোঁয়ে কলকাতাটো টুকরা ঠস্ পড়িছে। অর্থাৎ লালপাহাড়ী শহর জমে ওঠায় কলকাতা কিছু নিষ্প্রভ হয়েছে। এই অহংকারের মর্যাদা রাখতে খরচখরচা এবং উৎসবের আয়োজনের বাকী রাখতেন না তাঁরা।

সব থেকে বড় উৎসব ছিল কালীপূজো, কালীপূজো থেকেই উৎসবের আরম্ভ। পনের দিন ধরে চলত কালীপূজোর উৎসব। তারপরই ছিল দোল—হোলি। রাজারা ক্ষত্রিয় বলে নিজেদের দাবি করে, ওদের বাড়িতে দেবতা ছিলেন—কালী এবং কৃষ্ণ। কালীপূজো বৎসরে একবার। কার্তিকের অমাবস্যায় একসঙ্গে দেয়ালি এবং শ্যামাপূজা। ফাল্গুনে বা চৈত্রে দোল হোলি—তারপর শ্রাবণে ছিল ঝুলন। এ ছাড়া ছোটখাটো উৎসব ছিল অনেক—কার্তিকে বা অগ্রহায়ণে রাস, পৌষমাসে ওদেশের উৎসব বাঁধ্‌না। চৈত্র-সংক্রান্তিতে গাজন চড়ক। আষাঢ়ে রথযাত্রা।

কালীপূজোর উৎসব ছিল বিরাট বিপুল। দোলের উৎসব ছিল তার পরেই। কিন্তু দোলের উৎসবে ছিল মদ বেশী, রাজাসাহেব কুমারসাহেবের উল্লাস বেশী; তাঁদের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের নিয়ে সে উৎসব ছিল তামসিক। কলকাতা থেকে আসত চার পাঁচ দল খেমটা। ওখানকার শ্রেষ্ঠ নাচিয়ে গাইয়ে এবং রূপসীদের বেছে বেছে আনা হত। এক সপ্তাহ ধরে চলত রঙের খেলা—নাচের আসর—বিলাস-ব্যাভিচারের পালা। ঠাকুরবাড়িতে প্রতিদলের জন্য একদিন সন্ধ্যায় আসর বসত; রাজাসাহেব কুমারসাহেব আধঘণ্টার জন্য সেখানে উপস্থিত থেকেই উঠে আসতেন। তারপর বাকী দল আর অন্তরঙ্গ পারিষদ এবং বিশিষ্ট অতিথি নিয়ে পালা বসত নানান স্থানে। কোন

দিন কুমারসাহেবের বাগানে, কোন দিন রাজাসাহেবের বাগানে, কোন দিন কোন নির্জন শালবনে, কোন দিন কোন জোড় বা ঝর্নার পাশে। পিকনিক থেকে শুরু, সন্ধ্যার পর সেখানেই আসর, উন্মুক্ত আকাশতলে পাথরের অসমতল বন্ধুর চত্বরে পাশবিক নৃত্য। এসবে তারাই ছিল গৃহিণী। এবং সাধারণ জীবনে রাজাসাহেব কুমারসাহেবের গৃহিণীদের যেমন তাঁদের সংসর্গের জন্য কোন কথা বলার অধিকার থাকে না— এই কয়েকটি দিন তাদেরও রাজাসাহেব কুমারসাহেবের স্বেচ্ছাচারে কোন কথা বলার অধিকার থাকত না। অবশ্য অধিকারই বা কি থাকতে পারত বা পারে এ ক্ষেত্রে। ব্যাভিচার-সঙ্গিনী—বিশেষ করে যেখানে তারা মাসে মাসে তাদের দেহমূল্য গ্রহণ করত সেখানে--যে মূল্য দিয়ে ব্যাভিচার করে--তার ব্যাভিচারের সীমানায় গণ্ডী টানবে কি দিয়ে? তাদের ঠিক অর্থাৎ অকৃত্রিম বেদনাও ছিল না এতে। ভালবাসা ছিল না যে! কেনাবেচার কারবারে ভালবাসা অচল জিনিস। কৃষির সঙ্গে তুলনা করলে বলতে হবে ভালবাসা ওখানে আগাছা। ও নিড়িয়ে তুলে না-ফেললে দেহ-ভাঙানো ফসলের চাষে ফসল ফলবে না। মায়েরা এ বিষয়ে মেয়েদের সেই ছেলেবেলা থেকে কানে মন্ত্রের মত ঢুকিয়ে দিয়ে থাকে। আর ভালবাসা হবে কার সঙ্গে—ক্রীতদাসীর সঙ্গে ক্রেতার? ভালবাসা অনবুঝ অবুঝ; রাজকন্যা রাখালকে ভালবাসে—ভিখারিনী রাজপুত্রকে ভালবাসে। কিন্তু রাজপুত্র রাজকন্যাকে কুলগৌরব রাজগৌরব বিসর্জন দিতে হয়। না-হলে হয় না। কুমারসাহেব ধনগৌরব বংশগৌরব কখনও ভোলেন নি। মনে আছে--যে দিন প্রথম দিন সে ওই লালপাহাড়ীর বাড়িতে ঢুকল সে দিন কুমারসাহেব তাকে সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে ড্রইংরুমে বসে বয়কে বলেছিলেন—পেগ দে। বাঈসাহেবকেও দে।

মদের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে আবার বয়কে ডেকেছিলেন—বয়!

!

—আরে চাবুকটো যেন কেমোন লাগ্ছে হে। দেখি—দেখি। আন্তো-ব।

শংকরমাছের লেজের চাবুক। দেওয়ালে টাঙানো ছিল।

সেটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে—বার কয়েক শূন্যে আস্ফালন করে বলেছিলেন—না। ঠিক রইছে। দে, রেখে দে! তারপর কাঞ্চনকে বলেছিলেন—জানো হে, আগে যে মেয়্যাটা ছিল না—ঐখানে—সি—

সে কথা অশ্লীল—সে অশ্লীলতা কুমারসাহেবের জিহ্বার বন্যভাষায় অশ্লীলতম হয়ে উঠেছিল। কথাটা হ'ল—পূর্বে যে এখানে ছিল তার কাছে তার কলকাতার একজন প্রিয়জন ছদ্ম পরিচয়ে আসা যাওয়া করত। পরিচয় দিয়েছিল সে তার ভাই। টাকা নিতে আসত। যে দিন আসল পরিচয় পেয়েছিলেন কুমারসাহেব সে দিন তাকে এবং সেই মেয়েটিকে এই চাবুক দিয়ে চাবকেছিলেন। পিঠ কেটে রক্ত পড়েছিল। আটকে রেখে ক্ষত সামলে তাদের বিদায় করেছিলেন। বলেছিলেন—পিঠের দাগ পিঠে থাকল হে, উ আর দেখায়ো না কারুকে। দেখায়ে যদি হুজ্জোত কর তবে কলকাতায় লোক আছে আমার—সাবাড় করে শেষ করে দিবেক। হুঁ। —সেই তখন থেকে ইটা উখানেই থেকে গেইছে। তা এখন উটা—এই বয়, উটা সামিলে রাখ হে—ওই আলমারিটোর পিছাতে রেখে দাও হে! হুঁ!

অর্থাৎ তাকে বলে দিয়েছিলেন—তোমার দেহ আমি মাসিক পাঁচশো টাকা মূল্যে কিনেছি। ওর উপর আমার অধিকার। সে অধিকার ভালবাসার বলে রক্ষা করি না, চাবুকের জোরে রক্ষা করি। কিন্তু সে তো কুমারসাহেবকে টাকা দিয়ে কেনে নি, মন্ত্র পড়ে কেনে নি; এবং তার চাবুকও নেই। ওখানে ভালবাসার স্থান কোথায়? ভালবাসার কথাই ওঠে না, ওঠে আর একটা কথা। সেটা হল— কুমারসাহেব যখন হোলির সময় অন্য নারী নিয়ে উল্লাস করতেন তখন

একটা ভয় হত ;—কুমারসাহেবের মত মাসিক পাঁচশো টাকায় দেহক্রেতার আশ্রয় হারাবার ভয়। সেই ভয়টাই ছিল মনে, সেইটেই খানিকটা ঈর্ষা বা ক্ষোভের চেহারা নিয়ে মনের মধ্যে জেগে উঠত। তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু তারও মূল্য আছে—তাকে অস্বীকার করা চলে না। চাঁপা অনবুঝের মত এই নিয়ে রাজাসাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করেছিল। রাজাসাহের তার মুখে এমন করে হাণ্টারের বাঁট দিয়ে মেরেছিলেন যে তার ঠোঁট কেটে তুফাঁক হয়ে গিয়েছিল। সেলাই করতে হয়েছিল। রাজাসাহেব তাকে অবশ্য দাম দিয়েছিলেন। একখানা খুব দামী মুক্তোর নথ। বলেছিলেন—উটাতে কাটা দাগটো ঢাকা পড়বেক। এই লে!

দোলের সময়টায় এই দ্বন্দ্বে পড়তে হত। মা বলত—দোলের ফাঁড়া।

মা থাকত কলকাতায় মাস কয়েক, বিশেষ করে গরমের সময়টায়; লালপাহাড়ীতে প্রচণ্ড গরম; পাথর পাহাড়ের দেশ, তার উপর কয়লাকুটির জন্য হাজার হাজার বয়লারের আঁচ- এবং লক্ষ কয়লার অনির্বাণ চুল্লীর উত্তাপ ও কালো কালির মত ধোঁয়া! গরমের সময় কোন কোন বছর তারাও কুমারসাহেব রাজাসাহেবের সঙ্গে পাহাড়ে কি সমুদ্রের ধারে যেত। মা আসত বর্ষা কাটিয়ে পূজোর পর কালী-পূজোর আগে, ফিরত বৈশাখে। দোলের সময়টায় মা লালপাহাড়ীতে থেকে মেয়েদের শান্ত রাখত, সামলাত।

ঝুলনের উৎসবটি ছিল বড় ভাল। চমৎকার লাগত তার। বর্ষার সময় বলে শামিয়ানা খাটিয়ে মেলা বসিয়ে উৎসব করা চলত না। এ সময়ে নাটমন্দিরের মধ্যেই উৎসবের গণ্ডী আবদ্ধ থাকত এবং উৎসব হত বড় বড় ওস্তাদ এবং বাঈদের বৈঠকী গানের জলসায়। কলকাতা কাশী লক্ষ্ণৌ অঞ্চল থেকে নামী ওস্তাদ এবং বাঈ আসত। সমঝদার শ্রোতা বসত তিন দিকে—রাত্রি দেড়টা দুটো পর্যন্ত চলত গান।

ধ্রুপদ খেয়াল ঠুংরী ভজন কীর্তন; বীণ সেতার এস্রাজ বেহালার বাজনা। মদ না-হলে রাজবাড়ির উৎসব হয় না; মদ থাকত কিন্তু তার পরিমাণ অত্যন্ত কম—অবশ্য লালপাহাড়ীর রাজবাড়ির মাপ অনুযায়ী। তাদের স্থান হত ওই ওস্তাদ গাইয়েদের একপাশে। চাঁপা গাইতে জানত কাজ-চালানো গোছের। থিয়েটার যাত্রায় সখীর ব্যাচে চলতে পারত, হয়তো বা দুজন খেমটাওয়ালীর সাধারণ আসরেও খানকয়েক শেখা টপ্পা-গজল গেয়ে চালাতে পারত, কিন্তু এ মজলিসে গান চলত না। সে ওস্তাদ বাঈদের পানটা এগিয়ে দিত, আতরের তুলোটা তুলে ধরত, গোলাপফুলের বোকে বিলি করত; গোলাপজল ছিটুতো। সে ছিল রাজসাহেবের পিয়ারী—ও অধিকারটা চাঁপাই পেত। সেও একপাশে থাকত। গোড়াতেই কুমারসাহেব তাকে বলতেন—কাঞ্চন বিবি, তুমি ঠাকুরের গান গেয়্যা দিয়া কৌলিকটো সেরে দাও!

সে কোনবার গাইত ভজন। কোনবার গাইত কীর্তন। প্রশংসাও পেত। কণ্ঠস্বর তার ভালই ছিল, গ্রামোফোন রেকর্ডে মানুষ তা তো স্বীকার করে নিয়েছে। শেখাটাও তখন নিন্দের ছিল না কিন্তু সে জানে কীর্তন বা ভজনের আসল বস্তুটুকু তার মধ্যে ছিল না। ও শুধু খোসা; রাঙা টুকটুকে পাকা আম আছে এক জাতের—তার সেই রাঙা খোসা শুধু। দেহব্যবসায়িনীর রাত্রির আসরে একরাত্রির নাগরের কাছে যত্নে-শেখা ভালবাসার কথা বলার মতই তার আসল দাম কিছু ছিল না।

এই ঝুলনের আসরেই তার জীবনের আবার মোড় ফিরল।

সেবার ঝুলনের আসর বসেছে—তারিখ শ্রাবণের বিশে; পূর্ণিমার চাঁদ আর মেঘে লুকোচুরির খেলা চলছিল আকাশে। কয়েকদিন ধরে বাদলার পর বিকেলবেলা থেকে মেঘ কাটছিল কিছুক্ষণের জন্য; আবার ছেয়ে আসছে আবার কাটছে। পূর্ণচাঁদের আলো এখনি

ঝলমল করে উঠছে আবার মেঘ আসছে—জ্যোৎস্না ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। আসরের ব্যস্ততার মধ্যে মন চোখ ওই খেলার শোভায় যেন বাইরে ছুটে যাচ্ছিল। ভুল হচ্ছিল।

মনেরও খানিকটা ছুটি। সেবার রাজাসাহেব কুমারসাহেব তুজনেই লালপাহাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন না। বড় একটা সত্বের মামলা চলছিল হাইকোর্টে—তার জন্যে তুজনেই গিয়েছিলেন পাটনায়। সাহেব কোম্পানীর সঙ্গে মামলা, বড় বড় উকীল ব্যারিস্টার নিয়ে তাঁরা ব্যস্ত। মামলায় হার হলে তিন চার লাখ টাকা যাবে।

ঝুলনের উৎসব সেবার নমো নমো করে সারবার ব্যবস্থা। বাঈ বায়না নাকচ হয়েছে টেলিগ্রামে। বড় ওস্তাদ এসেছিলেন মাত্র তুজন। কলকাতা থেকে ঢপ-কীর্তনওয়ালীদের সঙ্গে বাঁধা বায়না অনেক দিন থেকে, তারা যথানিয়মে এসেছিল। আসরটা ফাঁকা ফাঁকাই ঠেকছিল। মন বাইরে যাবার অবকাশও পাচ্ছিল। রাজাসাহেব কুমারসাহেব গানের আসরে যে স্তরের মানুষই হোক—আসরে মজলিসে তাঁদের দাম আছে। অতি সহজে তামসিক রাজসিক উল্লাসে আসর জমিয়ে তুলতে পারেন। তাঁরা না-থাকাতে শ্রোতার আসরও ফাঁকা ফাঁকা; বড় বড় কলিয়ারির মালিক ম্যানেজার এরা অনেকেই আসে নি। এসেছিল শুধু তারাই যাদের গানে অনুরাগ আছে। মধ্যবিত্ত লোকই বেশী ছিল সেবার। যথানিয়মে সে মন্দিরের সামনে রাজবাড়ির মাইনে-করা নাম-সংকীর্তনের দলের সঙ্গে একখানা কীর্তন গেয়ে নিয়ে আসরে বসেছিল, চাঁপা ওদিকে পান আতর বিলি করছিল, লক্ষ্ণৌএর খাঁসাহেবের সংগতকারেরা তানপুরা পাখোয়াজ নিয়ে সুর বেঁধে নিয়েছে—খাঁসাহেব সুর ধরেছেন, এমন সময় খবর হয়েছিল কুমারসাহেব এসে পৌঁছেছেন। পাটনা থেকে মোটর হাঁকিয়ে চলে এসেছেন—খেয়াল হয়েছে—সঙ্গে গেস্ট। আধঘণ্টার মধ্যেই এসে যাবেন। গেস্ট গেস্টহাউসে মুখ হাত ধুয়ে স্নান করছেন, কুমার

গেছেন অন্দরে। স্নান সেরে কাপড়-চোপড় বদলে আধঘণ্টার মধ্যেই এসে যাবেন। গান হচ্ছিল, বড় ওস্তাদের গান—কথাটা হৈ চৈ করে নয় কানাকানি করে ছড়িয়ে পড়ল—প্রথম এল তার কানে—তাকে উঠতে হবে। কারণ, কি জানি মরজি হলে কুমারসাহেব যদি বাগানবাড়িতে যান! কে বলতে পারে!

ত্রস্ত হয়ে সে বাগানবাড়িতে ফিরেছিল। কিন্তু কুমার আসেন নি। সে প্রতীক্ষা করছিল জানালার ধারে দাঁড়িয়ে। মুগ্ধ হয়ে বর্ষণধৌত নীল আকাশে পূর্ণিমার চাঁদের ঝলমল জ্যোৎস্নার শোভা দেখছিল। মন যেন হারিয়ে গিয়েছিল। তখনও মেঘ সম্পূর্ণ কাটে নি, কিন্তু ছিল চাঁদ থেকে অনেক দূরে! রাত্রি প্রথম প্রহর। চাঁদ পূর্বদিকে উঠে খানিকটা মধ্যাকাশের দিকে এগিয়েছে; মেঘ জমে আছে দিগন্ত ঘেঁসে; মধ্যে মধ্যে দক্ষিণ দিক থেকে কিছু কিছু মেঘ খানা খানা হয়ে খুব দ্রুতগতিতে উত্তর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মধ্যাকাশ ঝলমল করছে—যেন নীল রঙ থেকে ঠিকরে বা পিছলে পড়ছে আলো। ঘন সবুজ গাছের পাতায় জ্যোৎস্নার প্রতিবিম্ব ঝিকমিক করছে, মাটির বুকে, ঘাসের ভিজে পাতায় ছটা বাজছে, এখানে ওখানে পুকুরে খানায় ডোবায় জমা জলে চাঁদ ভাসছে। ঝকমক করছে জল গলা রুপোর মত। দূরে নালায়, জোড়ে অর্থাৎ ছোট পাহাড়ী নদীতে জলের ঢল নেমেছে, কলরোল উঠছে। একটা ঝোরা দেখা যাচ্ছে, ছোট ঝোরা—তার জলও গলা রুপো হয়ে গেছে। এমন মনহারানো রাত, ভুবনভরানো জ্যোৎস্না সে জীবনে আর দেখে নি। সে ভুলেই গিয়েছিল কুমারসাহেবের কথা, আসরের কথা। মনে হচ্ছিল—বর্ষার বাদলে অভিষিক্ত ঝিরঝিরে বাতাসে এমন রাত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওই ভিজে ঘাসে দেহ এলিয়ে দিয়ে নিষ্পলক হয়ে উপরে ওই চাঁদ-আঁকা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। অথবা ওই ঘন বন-ভরা পাহাড়ের মাথায় চড়ে হাত বাড়িয়ে চাঁদকে নাগাল পেতে চেষ্টা করে। এমনই

আবোলতাবোল অসম্ভব অর্থহীন কল্পনা। চিন্তাহীন কল্পনা, শুধু সাধ, চাঁদ-চাওয়া শিশুর মত সাধ।

হঠাৎ চাকরের ডাকে বাস্তবে ফিরে এসেছিল সে। সে খবর এনেছিল—হুজুর তো বরাব্বর হুঁয়া ক্যা নাম হ্যায়—জলসাকে আসরমে আ গিহিস্। বিবিসাহেবকে পর হুকুম হুয়া হুঁয়া জানে কে লিয়ে! দারোয়ান খাড়া হ্যায় নিচে।

তৎক্ষণাৎ স্বপ্ন ছুটে গিয়েছিল—আশ্চর্য, দেহমন চঞ্চল ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। যেতে বলেছেন? চল যাই! ও মা! দেরি হয়ে গেল হয়তো!

নাট মন্দিরে তখন কার গান সবে শুরু হয়েছে।—আ—!

কে গাইছে? কোন্ গায়ক! আহা! বড় মধুর কণ্ঠ! বাঃ!

* * *

অল্পবয়সে মোর, শ্যামরসে জরজর,
না জানি কি হবে পরিণামে
যদি নয়ন মুদে থাকি অন্তরে গোবিন্দ দেখি
নয়ন মেলিয়া দেখি শ্যামে।

কীর্তন গাইছিলেন এক অচেনা গায়ক। পাশে কুমারসাহেব বসে আছেন। আসরের আশ্চর্য অবস্থা। সুবেশ সুদর্শন গায়ক—আশ্চর্য দরদের সঙ্গে গান গেয়ে চলেছেন। চোখ বন্ধ করে গাইছেন। গোটা আসরটা যেন স্তব্ধ, মগ্ন। কারুর হাতে সিগারেট নেই। কোথাও কোন ফিসফাস নেই। চাঁপা তাকে ইশারায় চুপিচুপি একপাশে বসতে বললে। সে বসে পড়েছে বিস্ময়ের সঙ্গে। চাঁপা উচ্ছলা—তার সব-তাতে-হাসি মুখে হাসি নেই। বসল বিস্ময়ের সঙ্গে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে অভিভূত হয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত কাঁদল।

মার্গসংগীতে যা' আছে কীর্তনে তার সব আছে, কিন্তু তার কারু বড় নয়, তার ভাব বড়। সেই জন্যে আখর আপনি আসে। গানের

কথা বলেই কথার শেষ হয় না। ভাবের জোয়ার কথার ফেনা তুলে বেরিয়ে আসে। যখন তাতেও কুলায় না তখন যে গায় সেও কাঁদে, যে শোনে সেও কাঁদে। তফাতটা কি জান কাঞ্চন,—জ্ঞানী আর ভক্তে যা তফাত সেই তফাত।

অনেক দিন পর বলেছিলেন তার গুরু।

ওই উনিই তার গুরু। নাম তাঁর করবে না। তার গুরু, তার স্বামী, তার সব। জীবনটাকে ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছেন তিনি। আজ যে এই অবস্থায় মরতেও কোন খেদ নেই—এর মূলধন তিনিই দিয়ে গেছেন। মুক্তামালা—ও-ও তাঁর দান। ওর আর একটা নাম আছে—তাঁর দেওয়া নাম—মালতীমালা। শ্যাম-মনোহর গোবিন্দ মালতীমালায় পরিতৃপ্ত।

লেখাপড়া-জানা, শিক্ষিত, পণ্ডিত মানুষ, ভালঘরের ছেলে—একসময় প্রথম যৌবনে ছিলেন দুরন্ত সাহেব। পেশায় ছিলেন উকিল। সুন্দর সুপুরুষ চেহারা, লম্বা মানুষ, টিকলো নাক, শ্যামবর্ণ মানুষটির সারা দেহে যত কান্তি তত পৌরুষ। তার উপর এমনই সুন্দর কণ্ঠস্বর। গানে জন্মগত অধিকার ছিল; গান তিনি যত্ন করে শিখেও ছিলেন। প্রথম বয়সে উল্লাস করে ঘুরেই বেড়াতেন। মেয়েরা তাঁর পিছনে ছুটেছে। বাপ মারা গিয়েছিলেন ছেলেবয়সে—মায়ের অঞ্চলের নিধি ছিলেন, লেখাপড়া শেষ করে উকিল হয়েও বিয়ে করেন নি। মা পারেন নি রাজী করতে। তিনি বলতেন—জান—তখন সভ্যসমাজে বিলেতফেরত মহলে খুব খাতির জমিয়েছি, ওদের সমাজের ঘরের স্বাধীন জেনানাদের দেখে চোখে ঘোর লেগেছে। বিয়ে করতেও বেগ পেতে হত না। মেয়েরা আমার জন্যে পাগল এমন কথাটা আর বলব না—কিন্তু তাদের অধিকাংশের চোখের দৃষ্টিতে প্রেমের নিমন্ত্রণ দেখতাম। কিন্তু পছন্দ কাউকে হয়নি। মন যাকে চায়—যাকে পেলে সব পাওয়া হবে—সে কই?

হঠাৎ একদিন মনে হল—তাকে দেখতে পেয়েছেন। মস্তবড় বিলেত ফেরত ডাক্তারের মেয়ে। বাধা হল—স্বজাতি নয়। তিনি কায়স্থ—তারা ব্রাহ্মণ। তাদের কাছে সে বাধা বাধাই নয় তখন। বাধা শুধু মায়ের কাছে।

বিলেতঘোরা মেয়ে। বাপের সঙ্গে বিলেত ঘুরে এসেছে। এ দেশে বি-এ পাস করেছিল! মারীচ হয়েছিল মায়ামৃগ—মায়ামৃগের অপর নাম স্বর্ণমৃগ। এ মেয়ে ছিল স্বর্ণমৃগী—মায়ামৃগী। একে ধরা যায় না কিন্তু ধরা দেবার ভানে থমকে দাঁড়ায়; তার পিছনে না-ছুটিয়ে ছাড়ে না।

স্বর্ণমৃগীও যে বাঁধা পড়েছিল। তাঁকে দেখে না ভুলে তো পারে নি। শেষ পর্যন্ত ধরা দিলে।

তিনি বলতেন--আশ্চর্য কাঞ্চন—সে মদ খায় দেখেও আমার মোহ ছুটল না, মোহ বাড়ল। মনে হল জন্মজন্মান্তর ধরে একেই খুঁজে এসেছি।

তার বাপ অবশ্য তাকে মানা করেছিলেন। অমতও করেছিলেন। বলেছিলেন—দেখ—আমার মেয়ের জন্যে পাত্র চাই আই-সি-এস, আই-পি-এস। আমি তেমনি করেই ওকে মানুষ করেছি। ওকে ঝোঁকের মাথায় বিয়ে করলে দুজনের কেউ সুখী হবে না। না, এতে মত আমি দেব না। দিতে পারি না।

কিন্তু তখন ওই স্বর্ণমৃগী বাঁধন পরেছে স্বেচ্ছায়। নেশায় পড়েছে। দড়ি হল—গান শেখা।

ইনি বৎসরখানেক ধরে ছুতায় নাতায় ছুটে যেতেন বম্বেতে। বম্বেতে প্র্যাকটিস করতেন কর্নেল সাহেব। শেষবার—সেবার পুজোর ছুটিতে বম্বেতে গেলেন; প্রথম দিন ওদের বাড়িতে বেড়াতে যেতেই সে ঠোঁট মচকে বলেছিল—এসেছেন! আমি কিন্তু চলে যাচ্ছি! যাচ্ছি নৈনীতাল।

এঁর মুখ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে উঠেছিল।

সে ব্যঙ্গ করে বলেছিল—বেচারা!

উনি চলে এসেছিলেন হোটেলে। ভাবছিলেন—তিনিও নৈনীতাল যাবেন কি না।

পরের দিন ভেবে চিন্তে—না—নৈনীতাল যাবেন না, কন্যাকুমারী যাবেন এবং সেখান থেকে কলকাতা ফিরবেন স্থির করে টাইমটেবল দেখছেন এমন সময় বেয়ারা খবর দিয়েছিল টেলিফোন আছে।

—টেলিফোন?

—হ্যাঁ—কোন মেমসাহেব কথা বলবেন।

—মেমসাহেব?

তবে সে? টেলিফোন তখন সুলভ হয় নি। তবে কর্নেল সাহেবের বাড়িতে টেলিফোন আছে। নিশ্চয় সে।

হ্যাঁ সেই। বলেছিল—কি করছেন? নৈনীতাল যাচ্ছেন না কি?

—না!

—না?

—হ্যাঁ। যাচ্ছি—কুমারিকা।

—ও বাবাঃ। আমি উত্তরে যাব বলে আপনি একেবারে উল্টোমুখে—দক্ষিণে? তা—কবে?

—সম্ভবতঃ কাল।

—সম্ভবতঃ কেন? Why not—certain?

—কারণ বার্থের চেষ্টা করব। পাওয়া চাই।

—পাবেন না।

—মানে?

—সে ফোনে বলা হয় না, আপনি আসুন না!

—সন্ধ্যের সময় চেষ্টা করব। এ বেলাটা মাফ করুন।

সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনটা রেখে দেওয়ার শব্দ হয়েছিল। ইনি একটু

অপ্রতিভ হয়ে ভাবছিলেন—হয়তো ঠিক হল না। ও বেলায়
কিনা তাও বিবেচনা করছিলেন। কারণ হয় শুনবেন—বেরিয়ে গেছেন
নয় শুনবেন—শরীর খারাপ, শুয়ে আছেন—মাফ চেয়েছেন—এটা
নিশ্চিত।

কিন্তু আধ ঘণ্টা যেতে-না-যেতে স্বর্ণমৃগী নিজেই এসে হাজির
হয়েছিল। এবং বিনা ভূমিকায় বলেছিল—নৈনীতাল ক্যান্সেল করে
দিলাম।

—ক্যান্সেল করে দিলেন? মানে?

—yes, ওতে যা মানে হয় তাই। টিকিট রিফাণ্ডেড, হোটেলে
arrangement cancelled—আমি যাচ্ছিনা।

—কিন্তু কেন?

—আমার ইচ্ছা—আমি সোসাইটিতে গ্যাদারিঙে গাইবার জন্যে
চারখানা গান শিখতে চাই।

বাঁ হাতের চারটি চম্পককলির মত আঙুল তুলে দেখিয়েছিল।
এবং একটি রহস্যময় মৃদু হাসি মুখে টেনে তাঁর দিকে তাকিয়েছিল
কোন যাদুকর বা যাদুকরীর মত।

হাসি পাওয়ার কথা। কিন্তু এঁর হাসি পায়নি। অবাক হয়েই
তাকিয়ে ছিলেন স্বর্ণমৃগীর দিকে। মুখের হাসিটি একটু বাড়িয়ে দিয়ে
বলেছিল সে—এবং সে শেখাবেন আপনি।

ইনি সেটা অনুমান করেছিলেন, বলেছিলেন—বেশ তো।

—Thank you! কি বলব? মাষ্টার মশাই?

—যা খুশি!

—কি চাই দক্ষিণা?

ইনি বলেছিলেন—আপনাকে মালা পরবার ফুল যোগাবার
অধিকার দেবেন। আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর। আপনি
হবেন রানী।

স্বর্ণমৃগী মায়াময়ী অকস্মাৎ উঠে তাঁর বুকের উপর পড়ে গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল—আমাকে তুমি নাও। আমাকে তুমি নাও। নইলে আমি বাঁচবনা!

শুধু কথা নয়, কথার সঙ্গে কান্না।

এরপর তার বাপের বাধা হয় নি। তাঁরা দুজনে গোপনে বিয়ে করে মাদ্রাজ পালিয়েছিলেন। মাদ্রাজ থেকে গয়া। গয়াতে ছিল এঁর বাড়ি—গয়াতেই করতেন প্র্যাকটিস।

তিনি বলতেন—গয়াতে পাটনাতে এ গল্প মোটামুটি জানে সকলে। কিন্তু জানা আর বোঝা তো এক নয়। লোকে হাসে ব্যঙ্গ করে, আমাকে বলে ক্লীব। নিবীর্য। তা বলতে পারে। বলবারই কথা। কর্নেল চ্যাটার্জী—আমার শ্বশুরও আমাকে বলেছেন এ কথা। বিয়ের পর আমাকে বলেছিলেন—আমার কথা শুনলে না, বিয়ে করলে। কিন্তু এই কথাটা শুনো। আমার মেয়ে হরিণী নয় বাঘিনী, ময়ূরী নয় ঈগল। তুমি খুব সফ্‌ট্ (soft)—শক্ত হতে হবে। She is a tigress—you be a tiger. কিন্তু—

পুরনো কথা বলতে বলতে তিনি হাসতেন; আশ্চর্য হাসি। হঠাৎ চাঁদ মেঘে ঢেকে গেলে যে জ্যোৎস্না হয় সেই জ্যোৎস্নার মত হাসি; বলতেন—মানুষ কি বাঘ হতে পারে কাঞ্চন? অন্ততঃ যাকে ভাল বেসেছি তার কাছে হতে পারি নে। তা পারি নি।

আবার কিছুক্ষণ থেমে বলতেন—তার জন্যে আমি মরতে পারতাম। বিয়ের পর গয়ায় এসে দেখলাম—এ তো তার থাকবার মত বাড়ি নয়, ঠাঁই নয়, তা ছাড়া বাড়িতে মা। আর গয়ার যে আয়—বাবার রেখে-যাওয়া যে টাকা তাতে তার শখ মিটিয়ে, আমার সাধ মিটিয়ে তাকে সাজিয়ে কদিন চলবে? চলে এলাম পাটনা—হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করব। কদমকুঁয়ার দিকে বড় বাড়ি নিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে প্রাণপাত পরিশ্রম করতে লাগলাম। মাস ছয়েক তার ভালই

লেগেছিল। তারপর শুরু করলে আমার সঙ্গে ঝগড়া! যুদ্ধ। আমি কখনও আঘাত করি নি, সয়েই গেছি। সে রাগ করে আজ বম্বে, কাল কলকাতা ছুটতে লাগল। গরমের সময় পাহাড়। বাড়ি খালি। আমি একা। আমার তখন প্র্যাকটিস জমেছে। এর উপর মদের মাত্রা বাড়ল। তার বাপ তাকে গহনা দিয়েছিল—আমিও কম দিই নি। সেই নিয়ে একদিন সে চলে গেল। আর ফিরল না। বছর চারেক পর। পালাল এক ফিরিঙ্গীর সঙ্গে। ইংল্যাণ্ড চলে গেল। আমার সব ভেঙে গেল। পাটনায় থাকতে পারিনি। তখন লজ্জাবোধ হয়েছিল। প্র্যাকটিস তখন আমার জমাট তবুও চলে গেলাম ছেড়ে। কি হবে? গয়াতেও যেতে পারি নি—ভেবে চিন্তে আমাদের দেশ বর্ধমানে এলাম। তারপর শান্তি কোথায় খুঁজতে খুঁজতে পেলাম পদাবলী। নিজে গাইতে জানি। এবার বুকের দুঃখ দিয়ে পদাবলীর স্বাদ পেলাম; ভগবানের শ্রীঅঙ্গের সুরভি পেলাম। বারকয়েক যেন তাঁর ইশারা ইঙ্গিত কৌতুক অনুভব করেছি। তখন থেকে কীর্তন গাই। এবার এসেছিলাম পাটনায় কেস নিয়ে। কলিয়ারির কেস। দাসসাহেব ব্যারিস্টার কীর্তনভক্ত। পাটনায় গেলেই ওঁর বাড়ি যেতাম। কীর্তন গাইতাম। সেবার আলাপ হল কুমারসাহেবের সঙ্গে। দাসসাহেবের বাড়ি গানের আসরে এসেছিলেন। গান শুনে ধরলেন—যেতেই হবে ওঁর বাড়ি, আজই, ঝুলনে—ওস্তাদ আসবে, জলসা হবে। না বলতে পারলাম না; ভগবানের আসর। চলে এসেছিলাম। ওস্তাদ খাঁসাহেব চিনতেন। তিনিও বললেন—গান বাবুজী, বহুৎ রোজ গান শুনিনি আপনার। কি করব? গাইলাম। এত বড় গুণীর অনুরোধ। তা ছাড়া সামনে মন্দিরে ভগবানের বিগ্রহ!

গুণীরা বাহবা দিয়েছিল, তিনি গাইতে গাইতে কেঁদেছিলেন।

"কহিনু তোমার আগে দাগা পেলাম শ্যাম দাগে,
এ ছার জীবনে নাহি দায়।
তিল তুলসী দিয়া সমর্পণ কৈনু হিয়া
জনমের মত রাঙা পায়।"

গাইতে গাইতে তাঁর চোখ দিয়ে দরদর ধারা বেয়ে গিয়েছিল। কেঁদেছিল অনেকে—তার সঙ্গে সেও কেঁদেছিল। এক অনাস্বাদিত রস অনুভব করেছিল সে। সংগীতের ভাবরস যে এমন বস্তু তা সেদিন প্রথম অনুভব করেছিল সে।

পরের দিন ভোরবেলা তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। দেহ ছিল পরিচ্ছন্ন, মন ছিল কেমন উদাস প্রসন্ন। সেদিন ওই ওঁর জন্যেই গোটা আসরটাই যেন পবিত্র হয়ে উঠেছিল।

তাঁর গানের পর অবসর পেয়ে চাঁপা তাকে বলেছিল—মস্ত মানী লোক আর ভক্তলোক দিদি। আসরে গান গাইবার আগে বললে কি জানিস? বললে—একটি অনুরোধ করব হাতজোড় করে। আমি কীর্তন গাইছি—ভগবানের নাম—সামনে গোবিন্দের মন্দির। এ আসরে আমাদের দেশের বিধানমতে ধূমপান করতে নেই। তাতে গান আর নামগান থাকে না—গান বিলাস হয়। ব্যস—কুমার বললেন—নিশ্চয়। তারপর একেবারে ভোল পাল্টে গেল। নিরিমিষ নয়—একেবারে হবিষ্যির আসর। শেষ কথাটা বলে সে হাসতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু হাসতে পারে নি। হাসি যেন ঠোঁটের ডগায় এসেও আটকে গেল।

কুমারসাহেব মদ না খেয়ে থাকতে পারতেন না, তিনি উঠে গিয়ে মদ খেয়ে আর আসরে বসেননি—নাটমন্দিরের বাইরে চেয়ার নিয়ে আলাদা বসেছিলেন। উনি আরও গান গেয়েছিলেন। ওস্তাদের অনুরোধে তাদের পর হিন্দীতে বেহাগ গেয়েছিলেন—তাও ছিল

রাধাকৃষ্ণের গান ; তারপর ভজন ; ঢপ-কীর্তনের সময় উঠে গিয়ে তাদের মধ্যে বসে দোয়ারকি করতে করতে শেষ পর্যন্ত তিনিই হয়েছিলেন মূলগায়ক।

গানের আসর শেষ হয়েছিল রাত্রি দেড়টায়। কুমারসাহেব অতিথিকে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন গেস্টহাউসে ; সে ফিরে এসে তাঁর প্রতীক্ষা করে বসেছিল, বয়কে বলেছিল, মদের বোতল সোডা খানা সাজিয়ে রাখতে, কারণ সে লক্ষ্য করেছিল কুমারসাহেব ক'বার উঠে গিয়েছিলেন পানীয়ের ঘরে। যে ক'বার গিয়েছিলেন কুমার-সাহেব তাতে তাঁর তেষ্টা মেটার কথা নয়। তিনি তেষ্টা নিয়ে আসবেন—এবং তেষ্টার ব্যবস্থা ঠিক নেই দেখলে চটে যাবেন। কিন্তু কুমার আর সেদিন আসেননি। তার নিজেরও গলা ভিজিয়ে নেওয়ার ইচ্ছে হয় নি। মন যেন ভরপুর হয়েছিল। চোখের জল কিছুক্ষণ পড়লেই মনে হয় ভিজে মাটির মত। মেঘলা-আকাশ দিনের মত। সেই মন নিয়েই সে শুয়ে পড়েছিল। তার ঘুম সাধারণতঃ ভাঙে একটু বেলায়, কিন্তু সেদিন ঘুম ভেঙেছিল ভোরে। তার কারণ ছিল। কানে এসে ঢুকেছিল তানপুরার ঝঙ্কারের সঙ্গে তাঁর কণ্ঠের রাগিণী আলাপ। ভৈরবীতে আলাপ করছিলেন। সে আলাপের বাণী শুধুই ছিল—"রাধা কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ—রাধা রাধা রাধা কৃষ্ণ।"

ছোঁয়াচ লেগেছিল তারও মনে। সে নিজেও গুণগুণ করতে শুরু করেছিল। কিছুক্ষণ পর ডেকেছিল তার নিজের ওস্তাদকে। ওস্তাদ বাগানবাড়িতেই থাকত। ওস্তাদকে বলেছিল—দেখুনতো ঠিক হচ্ছে কিনা এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তার গান শেখার আসরটি জমে উঠেছিল। আসর ভেঙেছিল চাকরের তাগিদে। বেলা হয়েছে অনেক। বিকেলবেলা কুমার সাহেবের হুকুম এসেছিল—আসর পাততে। অতিথিকে নিয়ে তিনি আসছেন।

বুকটা তুরতুর করে উঠেছিল। উনি আসবেন! উল্লাস ভয় দুই মিশে সে এক আশ্চর্য তুরুতুরু আবেগ। কত ভাবনা ভেবেছিল! উঁনি কি মদ খাবেন? উনি কি—?

সন্ধ্যেবেলা কুমারসাহেব তাঁকে নিয়ে এলেন। বললেন—সকালে গান গেয়েছিলি তুই, উনি শুনেছেন। গলার সুখ্যাত করলেন—তো বললাম—চলুন শুনিয়ে দি!

মিষ্টি হেসে তিনি বলেছিলেন—হ্যাঁ, কণ্ঠস্বরটি ভাল! চমৎকার কণ্ঠস্বর। ঘষামাজাও হয়েছে—আরও দরকার অবশ্য।

কুমার বসেই মদ খেয়েছিলেন, তিনি খাননি। তাকে খেতে হয়েছিল। লজ্জা তার হয়েছিল! কিন্তু কুমার সাহেবের সামনে না বলার সাহস ছিল না।

তারপর কুমার বলেছিলেন—লে ধর গান ধর।

তিনিই বরাত করেছিলেন—যা তোমার খুব ভাল শেখা আছে তাই শোনাও।

শুরু করেছিল সে খেয়াল দিয়ে। ভালই গেয়েছিল। প্রশংসা করেছিলেন তিনি। কিছুক্ষণ পর কুমার তাঁকে ধরেছিলেন—আপনার একখানা হোক।

তিনিও ধরেছিলেন—খেয়াল। সেখানা শেষ হতেই সে বলেছিল—একটা কথা বলব?

হেসে তিনি বলেছিলেন—বল!

একখানা কীর্তন—

তিনি শিউরে উঠে বলেছিলেন—না। কীর্তন এখানে হয় না।

ওই এক কথাতে সব যেন কেমন ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। তিনি একটু হেসে বলেছিলেন—দেখ—কীর্তনের গানের কথা সুর সব ভগবানের সঙ্গে; মানুষের সঙ্গে নয়। শ্রোতা ওখানে উপলক্ষ্য। উপযুক্ত স্থান নইলে ও গান গাইতে নেই। গাইলেও আসে না।

পয়সা নিয়ে আসর করে যারা কীর্তন গায়, মানুষকেই শোনায়—তাদের গানে সেইজন্যে প্রাণ থাকে না। কণ্ঠে সুর, শিক্ষার জ্ঞান যতই থাক মনে ভক্তি আর পবিত্রতা না থাকলে কীর্তন হয় না; সে মিথ্যে গাওয়া হয়। তার থেকে অন্য কিছু শোন। একটু থেমে বলেছিলেন—মির্জা গালিবের গজল জান? শোন—এমন গজল আর হয় না। মস্ত কবি। প্রেমিক পাগল কবি। প্রিয়ার জন্যই কেঁদে গেলেন সারা জীবন। আর মজা কি জান, ওঁর সেই প্রিয়া আত্মগোপন করে—ওঁর খুব কাছাকাছি বাড়িতে থেকে ওঁর খাওয়া পরা সেবা সব করে গেলেন—কিন্তু সামনে এলেন না। কেন জান? উনি যদি সামনে ধরা দেন তো কবি হাতে স্বর্গ পাবেন—আর গান লিখবেন না। বলবেন—আবার কেন? কিসের জন্য? সুখের জন্যে গান কেন? গান তো দুঃখের জন্যে। দুঃখ নইলে গান হয়—কাব্য হয়? দেওয়ানা কবি। কাঁদছেন—কেউ বারণ করেছে—তা বলেছেন—এই যে হৃদয়—এ ইটও নয়, পাথরও নয়; এ কাঁদে কাঁদবে—কাঁদব আমি হাজার বার—তোমরা আমাকে কেউ মানা করো না। ওগো আমাকে তোমরা কাঁদতে দাও!

"রুয়েঙ্গে হম হাজারো বার হমে কই মানা না কিয়ো।" বলেই হারমোনিয়মের রিডের উপর অত্যন্ত হাল্কা অথচ অতিক্ষিপ্র চালনায় আঙুলগুলি বুলিয়ে সুরের একটি চকিত লহরী তুলে সা থেকে নি-য়ে পৌঁছে আবার ফিরে এসে মা-এ কণ্ঠ মিলিয়ে ধরলেন—আ। সঙ্গে সঙ্গে ঘরটা যেন স্বরমাধুরীতে ভরে গেল। কণ্ঠস্বরে মিষ্টতা বহুজনেরই আছে; অনেকে ঘষেমেজেও অর্থাৎ মার্জনা করেও সাধারণ স্বরকে মধুর করে তোলেন; মধুর কণ্ঠস্বরও মার্জনায় মধুরতর হয়। কিন্তু সাধারণ মিষ্ট বস্তুর স্বাদে এবং মধুর স্বাদে একটি পার্থক্য আছে—মধুর স্বাদের মধ্যে সৌরভের আমেজ আছে, আভাস আছে; তেমনি স্বরের মধ্যেও মাধুরীর পার্থক্য আছে; এক এক দুর্লভ

কণ্ঠস্বর আছে—যার মধ্যে পুষ্পসৌরভের আভাসের মত একটি কিছু আছে। হয়তো এক একটি রসের সৌরভ। ওঁর কণ্ঠ তেমনি একটি দুর্লভ কণ্ঠ ছিল—এবং তাতে করুণা রসের সৌরভের আমেজ। বেদনার গান হলে ওঁর গলা থেকে কান্না যেন ঝরে পড়ত।

'রুয়েঙ্গে হম্ হাজারো বার মুঝে কোই মানা না কিয়ো।' কাঁদব আমি হাজারবার, ওগো তোমরা আমাকে কেউ মানা করো না। মনে হল সত্যিসত্যিই তিনি কেঁদে সারা হয়ে যাচ্ছেন—আর সেই কান্নার দুঃখ থেকে মধু বল মধু—অপার তৃপ্তি বল তৃপ্তি—সুখ বল সুখ—আনন্দ বল আনন্দ-ঝরে পড়ছে এবং তাতে যারা শুনছে তাদের অন্তর টনটন করছে তবু অপার তৃপ্তি, অকল্পিত সুখ, আশ্চর্য আনন্দ অনুভব করছে।

হৃদয় তো মানুষের ইট নয় কাঠ নয় পাথর নয়, এই হৃদয় মানুষের বিচিত্র হৃদয়—এখানে কান্না পায়—কান্নাতেই সময়ে সময়ে শ্রেষ্ঠ সুখ, শ্রেষ্ঠ আনন্দ, শ্রেষ্ঠ তৃপ্তি।

ওঁর চোখে জলের ধারা ঝরতে চোখে দেখা যায় নি কিন্তু বুঝতে বাকী থাকে নি যে দরদর চোখের জলের ধারা ওঁর বুজে থাকা চোখের পাতার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইবার এবং সুরে ঢংএ বৈচিত্র্যের ফুলঝুরি ফুটাবার অবকাশ যেমন গজলে আছে তেমন বুঝি আর কিছুতে নেই; আর মানুষের মন তাতেই মেতে ওঠে। সাধারণ গজল হলে কুমারসাহেব নাচতে শুরু করতেন কিন্তু ওঁর কণ্ঠস্বরে ওই বেদনার আমেজ, করুণ রসের সৌরভের আভাস উপেক্ষা করে নাচতে পারেন নি। কিন্তু হায়, হায়, সাবাস, সাবাস, আহা—হা! এ করেছিলেন অনেক।

কাঞ্চন নিজে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল।

সে নিজে গান গাইত যে! বুঝত যে! তার উপর সে যে মেয়ে।

এমন গান! এমন কণ্ঠ! এত দরদ! তার উপর সে কসবীর মেয়ে হলেও তার হৃদয় ইটও নয় কাঠও নয় পাথরও নয়—তার হৃদয় নারীহৃদয়। হায় রে নারীহৃদয়! বাঁশির সুরে সে হৃদয় নিজেকে সমর্পণ করে দাসীত্ব বরণ করে নেয়।

* * *

এতকাল পরে রোগশয্যায় শুয়ে প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখী হয়েও কাঞ্চন কীর্তনওয়ালী আবেগ সম্বরণ করতে পারলে না। হঠাৎ থেমে গিয়ে একটু চুপ করে থেকে গুনগুন করে সেই গজলের সুরটি ভাঁজতে চেষ্টা করলে। রুয়েঙ্গে হম্ হাজারো বার মুঝে কোই মানা না কিয়ো।

কিন্তু মুক্তামালা বারণ করলে—থাক মা। একটু চুপ করে ঘুমোও।

মা কাঞ্চন বিচিত্র হাসি হেসে বললে—সেই আমি মরলাম।

দুই

বারণ যেই করুক আর যেমনভাবেই করুক—এই কথা বলতে শুরু করে কি থামা যায়? ও হল বাঁধ-বাঁধা নদীর বাঁধ ভেঙে জল বের হতে শুরু হওয়ার মত ব্যাপার। জল বের হতে শুরু হলে আর রক্ষা নেই। ভাঙনকে খুলে খুলে প্রশস্ত এবং গভীর করে নিয়ে সে বেরিয়ে বেয়ে চলে যাবে।

কাঞ্চন কীর্তনওয়ালী খানিকটা চুপ করে ছিল; দেহটা ক্লান্ত হয়েছিল; মনটাও উদাস হয়েছিল; মধ্যে মধ্যে মনে হচ্ছিল—থাক মেয়ের কাছে এ সব কথা না-বলাই ভাল। কিন্তু আসল কথাটা তো বলা হয়েই গেছে। আর যেটুকু আছে তার মধ্যে লজ্জার কি আছে, কলঙ্কের কি আছে? কিচ্ছু নেই—সে তো গৌরবেব কথা। তার জীবনের তপস্যার কথা! সে কথা বলবে না কেন? সে কথা না বললে আসল কথা যে বলাই হবে না।

তিনি বলতেন—"কাঞ্চন, মানুষ হল পুণ্যের সৃষ্টি। জন্ম থেকেই তার সন্ধান পুণ্যের, আনন্দের, অমৃতের। ভুল করে পাপ সে করে, পা পিছলে পাপের পঙ্কে পড়ে; ভুল ভাঙলেই সে ফিরে আসতে চায় —অনেক সময় লজ্জায় হতাশায় পারে না—কিন্তু পারলে তাকে পাপ ধরে রাখতে পারে না। পুণ্যের দরজা খোলা ফটক—ওর দরজা কখনও বন্ধ হয় না। পাপ হল পাঁক, পুণ্য হল জল। গঙ্গার দুই তীরে আকণ্ঠ পাঁক—ওই পাঁক থেকে একটু স'রে ঠেলে গিয়ে গঙ্গার স্রোতে নামলে—সেই জলে সব ধুয়ে যায়, পায়ের তলায় বালি মেলে! সাগরসঙ্গমে তীর্থের সঙ্গে যোগ হয়ে যায়।"

মানুষ ভগবানের পুণ্যের সৃষ্টি। তার দেহে সব আছে—কাম

আছে, ক্রোধ আছে, লোভ আছে, কিন্তু মনে আছে পুণ্য। পাপ করে তাই শান্তি নেই, সুখ নেই—আছে লজ্জা, আছে মনস্তাপ। এই কথাটিই সে বলবে যে মেয়েকে। এ কথা বলতে গেলে—নিজের পাপের কথা বলছে—পাপ থেকে পরিত্রাণের কথাটা না বললে চলবে কেন ?

মুক্তা তার পুণ্যের তপস্যার ফল।

মুক্তা তার জীবনের তপস্যা দেখেছে। তার পূজা দেখেছে—তার নামগান করা দেখেছে—তার ব্রত পালন দেখেছে। সে জেনে এসেছে তারা বৈষ্ণব। কাঞ্চনমালা যে কোন কালে দেহব্যবসায়িনী ছিল—সে যে দেহব্যবসায়িনীর কন্যা এ তো সে জানতই না। সেইটুকুই যখন জেনেছে তখন বাকীটুকু না-বললে চলবে কেন ?

কাঞ্চন বললে—জানিস মুক্তো—আমি মরলাম সেদিন—সে কথাটা আমি লুকিয়েও রাখি নি—একরকম খোলাখুলি বলেছিলাম। তাঁর সামনে, কুমারের সামনে, ওস্তাদের সামনে, তবলচীর সামনে বলেছিলাম। অবিশ্যি গানে।

ওঁর গান শেষ হলে কুমারসাহেব বলেছিলেন—দে তু ইবার তুর একখানা গান শুনায়ে দে! শুধু গান লয়—নাচ সমেত। জানেন বোসসাহেব, কাঞ্চন থিয়েটারে নাচত—অ্যাক্টিং করত। ভাল! ভাল করত! ওঃ, মর্জিনার পাটখানা যা চুঁটায়ে করেছিল—ওঃ সি যেন কলিজের ভিতরে রক্ত ছল্‌কায়ে ছল্‌কায়ে উঠত। শরীর যেন চম্‌কায়ে চম্‌কায়ে শিরশির করত! লে—গান কর—ঘুঙুর বাঁধ! মদের গেলাস লিবি নাকি মাথায় ?

তিনি তাকে লজ্জার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।

হেসে বলেছিলেন—কিন্তু আমি যে নিরিমিষ্যি বষ্টুম বোরেগী মানুষ কুমারসাহেব। গানবাজনা ভালবাসি, ভগবানের নাম করে আসতে বললেন, নামগান—তাই এসেছিলাম লালপাহাড়ীর ভগবানের

দরবারে। সকালে এখানে এসেছি—কাঞ্চনের গলা শুনে। ও গান গাইছিল—গেস্টহাউসে বসে শুনে ভাল লাগল—জিজ্ঞাসা করলাম—কে গাইছে ? আপনি বললেন—ভাল বাঈ এখানে থাকে। শুনবেন ? মদের গেলাস কিন্তু বেশী হয়ে যাবে। তুমি এমনি নাচ।

কুমার অপ্রস্তুত হন নি—রাগও করেন নি। ওটা তিনি পারতেন। অন্ততঃ সাহেব-সুবো-উকীল-ব্যারিস্টার, বন্ধু-ইয়ার এদের সম্পর্কে পারতেন। পারতেন না চাকর-বাকর, প্রজা-খাতক, কর্মচারী-মোসাহেব এদের সম্পর্কে। বোস সাহেবের কথা শুনে বলেছিলেন—এই ছাখেন রেগে গেলেন ত? তা মিছা বলেন নাই—আপনি বোরেগী। বেরসিক লোক। জানেন—বোরেগীরা তরকারি কাটাকে বলে তরকারি বিনোনো। কাটা বললে সি তরকারি আঁষ হয়ে যায়। আপনার তাই—মদের গেলাস মাথায় করে নাচলে মদের ছোঁয়াচ লাগবে। তা লে কাঞ্চন—শুধুই নাচ।

খুব প্রাণখোলা হাসি হেসেছিলেন কুমার সাহেব।—লে থিয়াটারের পালার একটা গান গা। সেই—ছি ছি এত্তা জঞ্জাল। এত্তা বড়া বাড়ি ইসমে এত্তা জঞ্জাল।

তখন কাঞ্চন তার মনের কথা-গাঁথা গান খুঁজে পেয়েছে। তার মনে পড়ে গেছে সাজাহান নাটকের সখীদের গান—

আজি এসেছি আজি এসেছি বঁধু হে
লয়ে এই হাসি রূপ গান

*   *   *

তোমার চরণ তলে শরণ লভিব বলে
আসিয়াছি তোমারই নিদান।
এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো
সে মরণ স্বরগ সমান।

চাঁদের আলো ছিল না—দিনের বেলা—তা হোক, তবুও ওই

গানের কথায় আর তার মনের কথায় কোন অসামঞ্জস্য ছিল না। সত্যই সে দিন সে মরলে মনে হত তার স্বর্গ। যদি তিনি তাকে তার আগে বলতেন—কাঞ্চন তোমাকে আমি ভালবাসি!

প্রাণ ঢেলে সে গেয়েছিল এবং নেচেছিল। তিনি বুঝেছিলেন কিনা তিনিই জানেন। তবে প্রশংসা করেছিলেন। কুমারসাহেব খুব খুশী হয়েছিলেন। আবার অখুশীও হয়েছিলেন। বোসসাহেব চলে গিয়েছিলেন সেই দিনই বিকেলবেলা। সন্ধ্যেবেলা কুমারসাহেব এসে ধপ করে বসে সটান শুয়ে পড়ে বলেছিলেন—মদ আন তো কাঞ্চন।

মদের গেলাস সামনে ধরতেই কুমার বলেছিলেন—উ বেলা গান নাচ আচ্ছা হয়েছিল মাইরি। বোসবাবু খুব তারিফ করেছে।

—সত্যিই উনি খুশী হয়েছেন?

—তা হয়েছে। কিন্তুক—

স্থিরদৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন কুমার।

মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল কাঞ্চনের। সে বুঝতে পেরেছিল চাউনি দেখে।

ভুরু নাচিয়ে কৌতুক করে কুমার বলেছিলেন—কি বেপার বল দেখি? মজেছিস? লয়?

কাঞ্চনের মনে হয়েছিল সে যেন ভয়ে পঙ্গু হয়ে গেছে। তবুও সে ছলাকলাপটীয়সী দেহব্যবসায়িনীর মেয়ে—নিজে অভিনয় করেছে। সে বলেছিল—আপনি ক্ষ্যাপা কুমারসাহেব। মরণ আমার! মজতে যাব কেন?

কুমার খপ করে তার হাতখানা টেনে নিয়ে নিষ্ঠুর একটা চিমটি কেটে ধরে স্ক্রুর প্যাঁচ কষার মত চিমটিতে-ধরা মাংসটুকু ঘোরাতে ঘোরাতে বলেছিলেন—মজবি ক্যানে? ওই শালার রূপে! শালার গুণে! বল্—বল্!

চীৎকার করে কাঁদতে ওখানে মানা। রাজাদের বাগান শুধু প্রমোদভবনই নয়—একাধারে প্রমোদভবন কারাগার দুইই। ত্রিসীমানায় লোক হাঁটে না। চীৎকার করে কাঁদলেও কেউ শুনতে পায় না, ফল হয় বেয়াদপির অপরাধ, যোগ হয় মূল অপরাধের সঙ্গে। শাস্তি বাড়ে। রুদ্ধকণ্ঠ, মর্মবিদ্ধ মানুষের মত অথবা পাখীর মত তার দেহখানা এঁকে বেঁকে গিয়েছিল—ফুঁপিয়ে লুটিয়ে পড়েও সে বলেছিল—না—না—না।

—তবে উয়ার ছামুতে তোর গান নাচ এত ভাল হল ক্যানে রে? অঁ? উঁঃ—একবারে রসে ঢলঢল। বান ডেকে গেল! বল্।

কাঞ্চন তবু বলেছিল সেই আর্তকণ্ঠে—না—না—না।

এবার কুমার ছেড়ে দিয়েছিলেন—কিন্তু প্রশ্ন করেছিলেন—সত্যি করে বল্। লইলে সেই চাবুকটো বার করব।

কাঞ্চন সুযোগ পেয়ে শুধুই কেঁদেছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে—উত্তর দেয় নি।

কুমার বলেছিলেন—কাঞ্চন বল্—বলছি।

—কি বলব?

—বেপারটো কি তুর? না মজলি তো গান এমন খুলল কি করে ব? অঁ?

কাঞ্চন বলেছিল—গানের আড়াআড়িতে। উনি এমন ভাল গাইলেন—আমি ভাল না গাইলে আমার ইজ্জত থাকবে কোথা? আপনি আমাকে রেখেছেন—আপনার ইজ্জত থাকবে কোথা?

—হুঁ! ই কথা টো তো ভাবি নাই। হঁ! তা হলে তো অন্যায় হল। লে—তা এক ঢোক মদ খা! লে লে কাঁদিস না মাইরী। লে এই আঙুটি টো লে। কেমন চুনি পাথরটো দেখ! লে। কাঁদিস না!

কিন্তু এ কথা লুকানো থাকে ক' দিন! একদিন না একদিন প্রকাশ হয়েই থাকে এবং তাই হল। পিঠে তার শঙ্কর মাছের চাবুক পড়েছিল সে দিন। প্রথম ঘা খেয়েই সে সাপের মত ফণা তুলে দাঁড়াল এবং স্বীকার করলে। কিন্তু সে দিন তারই ছিল জিত-পাল্লা।

কুমার তখন নতুন একটি মেয়েকে আবিষ্কার করেছেন। সে মেয়ে বাঙালী নয়। হিন্দুস্থানী মেয়ে—হামিদন বাঈ। মাত্র আঠার উনিশ বছর বয়স। বাড়ি তার কানপুর—এখানে এসে বাসা নিয়েছিল—বউবাজার ষ্ট্রীটে; কুমারসাহেব তার নেশায় পড়ে গেছেন। প্রথম ঘন ঘন কলকাতায় যেতে লাগলেন। কিছুদিন যেতে-না-যেতেই কলকাতা থেকে তার মা তাকে খবর দিলে। রাজাসাহেবের কাছে খবর পেয়ে চাঁপা খবর দিলে। মা, চাঁপা দুজনেই শঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু কাঞ্চন শঙ্কিত হল না। খুশী হল।

কুমারসাহেবকে রহস্য করে সবিনয়ে জানালে যে সে জেনেছে কথাটা। কিন্তু ওই পর্যন্তই—মান অভিমান কিছু করবার চেষ্টা করলে না। কুমার একটা গয়না এনেছিলেন তার জন্য—সেটা তাঁরই কাছে থেকে গেল।

রাসযাত্রার সময় লালপাহাড়ীতে আর এক ধুমধাম, সেই ধুমধামে হামিদন এল। মেয়েটা গাইতে ভাল পারে না—নাচতে পারে—আর আছে রূপ। অপরূপ রূপ।

কুমারসাহেব তাকে পাকাভাবেই এনে তুলেছিলেন বোধ হয়, কারণ বাঈজীদের, ওস্তাদদের বা যাত্রাওয়ালা থিয়েটারওয়ালা যারা এই সব উৎসবে লালপাহাড়ী আসে তাদের বাসা দেবার জন্য ব্যবস্থা করা আছে। বাড়িঘরের অভাব লালপাহাড়ীর রাজ এস্টেটে নেই। রাজাসাহেব এবং কুমারসাহেবের খাস বাগানবাড়ির ইজ্জত তাঁদের অন্দরের পরেই। ওখানে সাধারণ বাঈজী খেমটাওয়ালীদের থাকতে দেওয়া হয় না। কিন্তু হামিদনকে বায়না করে আনা হয়েছে বলে

প্রচার করেও তোলা হল কাঞ্চনের বাড়িতে। একেবারে সঙ্গে করেই নিয়ে এলেন কুমারসাহেব। বললেন—শুনছ হে কাঞ্চন, এ বাঈজী বড় ভারী বাঈজী—বহুত আচ্ছা নাচ—তেমনি খান্‌দানী আদমী। তা ইনাকে এই বাড়িতে রাখতে হবেক। ওই উধারকার ঘরটোতে হামিদন বিবি থাকবেক, লোকজন সব নিচে থাকবেক। বুঝেছ?

ফিক্‌ করে হেসে সে বলেছিল—খুব বুঝেছি?

চটে গিয়েছিলেন কুমারসাহেব। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—মানে?

—উনি এইখানে থাকবেন।

—হুঁ।

—আগে বললে যে আমার ঘরটাই খালি করে রাখতাম।

চমকে ওঠেন নি কুমার—সে লোক তিনি নন, তবে কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—না—না। ওই উপাশের ঘর হলেই হবে।

কাঞ্চন হেসে বলেছিল—যেতে তো হবেই আমাকে, তা তুদিন আগে ঘরখানা ছেড়ে ওঁকে দিলে কি ক্ষতি হত?

—যেতে হবে মানে? তু চলে যাবার মতলব ফেঁদেছিস?

—তা চিরকাল কি একজনাতে মন ওঠে, আপনি বলুন না? আপনি হামিদনকে দেখে মজেছেন—আমিও তো কাউকে দেখে মজতে পারি! পারি না?

—তু কাকে দেখে মজলি? বোসবাবু?

—তা মজলে কি নিন্দের হবে? বলুন আপনি।

কুমারসাহেব লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, তারপর হনহন করে কোণের দিকে গিয়ে লম্বা হাতখানা বাড়িয়ে আলমারির পিছন থেকে চাবুকটা বের করে এনে পিঠে বসিয়ে দিয়েছিলেন। অতর্কিতে নয়—তাই নিষ্ঠুর আঘাত হলেও দাঁতে দাঁত টিপে সে সহ্য করেছিল।

এবং মাথা উঁচু করেই বলেছিল—চাবুক রাখুন। আমাকে যা ঘা মারবেন শয়ে শয়ে তার খেসারত লাগবে। মরে গেলে লাশ সামলাতে পারবেন কিন্তু পুলিসে অনেক টাকা খাবে। তার উপর নমুনা দেখে হামিদন বিবি ভড়কে যাবে। তা ছাড়া এতদিন আপনার কাছে থাকলাম—আপনি পুষলেন—ছাড়াছাড়ির সময় কেন মিছে ঝগড়া করছেন বলুন! ভালয় ভালয় চলে যাব, এরপর দেখা হলে হাসিমুখে কথা বলব ; তাই ভাল নয়? এখন রাসের সময় নানান ঠাঁই থেকে লোক এসেছে—চাবুক রাখুন। যদি ছুটে পথে বের হই তো কি হবে ভাবুন তো!

কুমারসাহেব সত্যিই চাবুক রেখেছিলেন।

এর পরে কিন্তু কুমার তাকে বলেছিলেন—না, হামিদনকে আমি রাখবার জন্যে আনি নাই কাঞ্চন। তু যাস নাই। উটা তুকে আমি পরখ করছিলাম। এবং হে-হে করে হেসেছিলেন।

এর অবশ্য কারণ ছিল। রাজাসাহেব বলেছিলেন—ইটা খুড়া তুমি ভাল করছ নাই। কলকাতা দিল্লী লক্ষ্ণৌ যাই—জাত ধরম বাছি না—গান শুনতে যাই, রাত কাটাই, সি এক কথা, আর ই তুমি ঘরে এনে পিতিষ্ঠা করছ,—ই কেমন কথা হে! বাড়িতে ঠাকুর রইছে। জাত জ্ঞাত রইছে! না, না, ই ক'র নাই।

থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল কুমারকে। কারণ এর উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। সম্পত্তির অধিকার পর্যন্ত। সুতরাং কুমার থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। এবং কাঞ্চনকে ওই কথা বলেছিলেন। কিন্তু কাঞ্চন বলেছিল—আর হয় না কুমারসাহেব—আমার মন উঠেছে। আপনার টাকা আছে—অনেক মেয়ে আসবে—আমি আর থাকব না।

টাকা বাড়াতে চেয়েছিলেন কুমার—তবু থাকে নি কাঞ্চন। ওই চাবুকের ঘা খেয়ে তার ভয় কেটে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে যাকে সে

ভালবেসেছে তার জন্যে পাগল হয়েছে। সে যাবেই। তাকে তার পেতেই হবে। না-পেলে এ জীবনে কি ফল? কি হবে বেঁচে? কি হবে টাকায়? কিন্তু সেই কি সহজ? পথে দাঁড়িয়েছিল তার মা। ঘটনাটা ঘটবার সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতা থেকে খবর পেয়ে মা ছুটে এসেছিল।

আশ্চর্য!

এই মৃত্যুশয্যায় শুয়ে কাঞ্চন তার মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—আশ্চর্য রে মুক্তো; তাই আমি আজও ভাবি। মা আমার ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে—বিয়ের এক বছর যেতে-না-যেতে বিধবা হয়েছিল। তারপর ললাটের লেখন আর পাড়াগাঁয়ের সমাজ—তার সঙ্গে গরীবের ঘর—কপালে কলঙ্কের দাগ পড়ল—বাধ্য হয়ে এল কলকাতায়—হল কসবী খানকী। কিন্তু কসবী খানকীর অভ্যেসটা এমনভাবে পেয়ে বসল যে আমার কসবী মায়ের মেয়ে কসবী হয়েও ওই অভ্যেসটায় এত পোক্ত হতে পারি নি। ওঃ! বলে সে শিউরে উঠল।

মা এল—ছুটে এল—শর্তমত ছাড়বার সময় যে টাকা দেবার কথা তাই আদায় করতে। চাবুক যখন মেরেছে তখন তার দাম পেতে হবে তাই আদায় করতে। কলকাতায় তার মা তখন দুই মেয়ের টাকায় বাড়ি কিনেছে। বাড়িউলি হয়েছে। টাকা ছাড়া কিছু বোঝে না। এখানে এসে সমস্ত দেখে সে নিলে কুমারসাহেবের পক্ষ। বললে—পাগলামি করিসনে কাঞ্চন। রাজার ছেলে—ওরা নিজের সাতপাকের পরিবারকে ঠেঙায়, পাঁচ সাতটা বিয়ে করে—তুই তো কসবী—রক্ষিতা। এক ঘা চাবুক মেরেছে বেশ করেছে। কিছু টাকা নে। থাকতে বলছে—থেকে যা। এ রাজভোগ কোথায় মিলবে লা? আর মাসে মাসে এই টাকা?

কাঞ্চন ঘাড় নেড়ে বলেছিল—উঃ হুঁ। আমার মন উঠেছে। এ আমার ভাল লাগছে না। আমি আর থাকব না।

—হারামজাদী রাজকুমারী আমার—মন উঠেছে। মন উঠেছে কি লা? কুমার যদি এখানে মেরে পুঁতে দেয়?

—দেবে। তুমি ক্ষতিপূরণ নিয়ে বাড়ি করবে।

মা অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর বলেছিল—শোন্। ভাল ভাল লোকে বড় বড় লোকে বলেছে—আমার কথা নয়; আমাদের, যারা এই বৃত্তি করে তাদের ভালবাসা মানা; তাদের প্রেম করতে নেই। করলে সর্বনাশ হয়। শেষ জীবনে ভিক্ষে করতে হয়। মনস্তাপ সার হয়, যার প্রেমে পড়ে সে শেষ পর্যন্ত একদিন ছেঁড়া জুতোর মত ফেলে দিয়ে গঙ্গায় ডুব দিয়ে ঘরে ফেরে। আমি শুনেছি কাঞ্চন—যার প্রেমে তুই পড়েছিস সে লোকটা উকীল। তুই ভালবাসলে সে তোকে তো ভালবাসতে পারবে না! সে তো দুর্নামের ভাগী হবে না! আমি শুনেছি তার পরিবার নেই, পালিয়েছে। বিয়ে করে নি। না করুক—করতে কতক্ষণ? ও হল সোনার হরিণ, ও ধরতে যাসনে। ভাল বললাম, মন চায় শোন—না-চায় যা খুশি কর। কিন্তু দুঃখে পড়লে আমার দোরে যেন যাসনে। গেলে ঝাঁটা মেরে বিদেয় করব বলে দিলাম।

বলেই মা রাগ করে চাঁপার ওখানে চলে গিয়েছিল। সে যাওয়াটা প্রায় থিয়েটারের বইয়ের চলে যাওয়ার মত। বলতে বলতে চলে যাওয়া। উইংসের ভিতরে কথা শেষ হওয়ার মত।

কাঞ্চনের মন তবু মানে নি। সোনার হরিণ সে মায়াই হোক আর ছায়াই হোক—সে যে দেখে, তার যে তার পিছনে না ছুটে পরিত্রাণ নেই। ভগবান ভুলেছেন সোনার হরিণে। স্বয়ং লক্ষ্মী ভুলেছেন সোনার হরিণে। সে তো সামান্য মেয়ে। ও মানা যায় না! কিন্তু ভাগ্যের ফাঁকি তপস্যায় পূর্ণ হয়। সোনার হরিণের তপস্যা যদি প্রাণপাত ক'রে করে কেউ তবে সোনার হরিণ সে পাবে—তাকে পেতে হবে।

সে পেয়েছে। সেই কথাটাই তো মরণকে শিয়রে করে বলতে বসেছে মেয়েকে।

তপস্যায় বসলে তপস্যা পূর্ণ হবার আগে নানান বাধা আসে মুক্তো। লোভ দেখায়। বলে—ধন দেব, রত্ন দেব, রাজ্য দেব, সিংহাসন দেব, সুখ দেব ;—ওঠ। এ তপস্যা ছাড়।

কুমারসাহেব তাই বললেন—ওসব মতলব ছাড় কাঞ্চন। ওসব ছাড়। দেখ আমরা পুরুষ মানুষ, তায় রাজা-রাজড়ার ঘরের ছেল্যা। আমাদের স্বভাব উড়নচণ্ডে। তা তোদেরও মনে কি হয় না উসব ? হয়। বল তো মাইরি দিব্যি করে ? হ্যাঁ। উসব জানা আছে।—উ উকীল তুকে কি দেবে রে ? মুরদটা কত ? শালা—এমন দশগণ্ডা উকীল আমি এক হাটে কিনে আর হাটে বেচতে পারি। শুন—তুর মাসোহারা পঞ্চাশ টাকা বাড়ায়ে দিব আমি। আর গয়না একটো দিব খেসারত। তুর মা বলছে—কুমারসাহেব, উকে একটো বাড়ি করে দাও। আমি বুলেছি—তাও দিব, কিন্তু কলকাতায় লয়। এইখানে। পাকাবাড়ি করে দিব লালপাহাড়ীতে—শুধু বাড়ি লয়—ধানীজমি দিব বিশ বিঘা। আমি মরে গেলে উই থেকে খাবি তু বুড়া বয়সে। ছেলেপুলা হয় তোর ভোগ করবেক ; না হয়—মরে গেলে সি আবার ঘোরত হবে আমার এস্টেটে।

কাঞ্চন বলেছিল—না।

ওই একটি কথা। না। অত্যন্ত শক্ত তার কণ্ঠস্বর। সে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল।

তারপর এসেছিল—ভয় !

কুমারসাহেব তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি বললি ?

—না।

—না ?

—হ্যাঁ।

—চোপরাও হারামজাদী কসবী। চাবকে পিঠের চামড়া তুলে দেব।

শান্ত কণ্ঠে কাঞ্চন বলেছিল—দেন। পিঠ তো পাতাই আছে। এবং একটু হেসেছিল এর উপর। কুমারসাহেব বনদেশের রাজার ছেলে—বুনো বাঘের মত হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিলেন।—তবে রে··· অশ্লীল গালাগালি দিয়েছিলেন। এবং চাবুকটা পাক দিয়ে টেনে বের করে নিয়েছিলেন। কাঞ্চন আজও বলতে পারে না—এত বড় দুঃসাহসের জেদ সে কোথা থেকে পেয়েছিল সেদিন। বলতে পারবে না কেন? হায় মানুষের অবিশ্বাসী মন! সোনার হরিণ ছোটে—মানুষ ছোটে পিছনে। সে ছোটে পাহাড়ের মাথায় মাথায়—বনে অরণ্যের মধ্য দিয়ে। মানুষও ছোটে—লাফ দেয়, এ পাথর থেকে ও পাথরে, পড়লে অতল খদে পড়ে প্রাণ যায়। কিন্তু প্রাণ যাবার ভয়ে সে থমকে দাঁড়ায় না, ফেরে না। বনে অরণ্যে কাঁটা ফোটে—বাঘ সাপ ওত্‌ পেতে থাকে; সোনার হরিণ—মায়া, সে তারা দেখতে পায় না, তারা দেখে—যে মানুষ পিছনে ছুটছে তাকে। মানুষ তাদেরও ভয় করে না তখন। তাদের মুখের সামনে দিয়েই ছোটে। সে যে তখন উন্মাদ! না—। তপস্যা। তপস্যাতেই উন্মাদ করে। কাঞ্চনও তখন উন্মাদ। সে চাবুক হাতে কুমারসাহেবের সামনে একটু কাত্‌ হয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বলেছিল—এই নিন। মারুন। মা—।

শেষ 'মারুন' শব্দটার 'মা' এর পর আর উচ্চারণ করতে হয় নি। কুমার মেরেছিলেন চাবুক। লম্বা সাপের মত—না—সাপ বরফের মত ঠাণ্ডা, এ আগুনের জ্বালার মত জ্বালা ছড়িয়ে পিঠের ব্লাউস কেটে—হাতের হাতা কেটে—থুতনির গোড়ায় ডগার গিঁঠটা জ্বলন্ত পেরেকের মত বিঁধে গিয়েছিল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা

অবাধ্য অধীর অস্থিরতা বেয়ে গিয়েছিল—চীৎকার একটা গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠেছিল। কেঁপেও সে উঠেছিল—কিন্তু আশ্চর্য একটা উন্মত্ত শক্তিতে সে অবাধ্য অস্থিরতাকে বাধ্য স্থির করতে পেরেছিল, চীৎকারকে সে টুঁটি টিপে ধরেছিল। এবং ঠিক তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে থেকেছিল। তখন থুতনি থেকে রক্ত পড়ছে—সে অনুভব করছিল হাত থেকেও পড়ছিল। পিঠের কথা বুঝতে পারে নি। কিন্তু পিঠও খানিকটা কেটেছিল। কুমারসাহেব এই সহ্য করা দেখে বোধ হয় থমকে গিয়েছিলেন। কাঞ্চন আরও খানিকটা এগিয়ে এসে বলেছিল---থামলেন কেন? মারুন।

---কাঞ্চন! গর্জে উঠেছিলেন কুমার।

—মেরে ফেললেও হাঁ বলব না।

—বলবি!

—না। আমার জবাব ওই না।

—কাঞ্চন!

—না।

আবার চাবুক পড়েছিল।

কাঞ্চন সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করেছিল—না।

আবার চাবুক পড়েছিল।

এবার কাঞ্চন দুবার না বলেছিল—না—না।

আবার চাবুক।

এবার বার বার 'না' বলে চীৎকার করেছিল সে—না—না—না—না—না।

ওদিকে চাবুকও আরও দুবার পড়েছিল।

সাতখানা চাবুকের দাগ তার পিঠে পায়ে আঁকা আছে। আরও পড়ত। কিন্তু সাতবারের বার খোদ রাজাসাহেব ঘরে এসে কুমারের হাত চেপে ধরে বলেছিলেন—কাকাসাহেব, ই কি করছ? ছি। ছাড়।

—না—ছাড়। উকে চাব্কিয়ে আমি মেরাা ফেলব। পুঁতে দিব গাড়া করে! উ বলে কি না—।

—বলুক; তুমি রাজা। উ কসবী খানকী। উয়াকে চাব্কিয়ে কি হবেক! উয়ার থেকে একটা কুত্তার দাম বেশী।

—উ বলে—না বলেছি—হাঁ আর বলব নাই। হাঁ উকে বলাব আমি।

—উ ঠিক বুলেছে। তার লেগ্যা উকে বকশিস দাও তুমি। মুখের থুতু তুমি ফেলা দিছ মাটিতে। মুখের থুতু তো—থুতুই গো কাকাসাহেব—মুখে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ অমৃতি। মাটিতে ফেললে তখুন থুতু—তখুন কি আর চেটে তোলা যায়? খানকী রেখেছিলে—ছিল। তুমিই হামিদনকে এনে উকে ছাড়বে ঠিক করলে—তখুনিই তো উ মাটিতে ফেলা থুতু হয়ে গেল। মদ খেয়ে নেশার বশে মাটির থুতুকে অমৃতি ভেবে তুলতে গিয়েছ—থুতু বলেছে না—না। ঠিক বলেছে উ—উকে বকশিস দাও। এস তুমি। ভাল মেয়্যা এন্যা দিব। না হয় ওই হামিদনকেই রাখ তুমি। লালপাহাড়ীর এলাকার বাইরে ওই—ওই পলাশটুণ্ডির টিবিটোর মাথায় বাড়ি বানায়ে রেখে দাও। ঠিক পাহাড়ের মাথায় বাড়ির মতুন লাগবে। এই তো চার মাইল পথ। চলে যাবেক—গাড়িতে ভোঁ করে পাঁচ মিনিটে। ব্যস। রাখ ই সব রাখ। মশা মারতে কামান দাদা। ছারপোকা মেরে হাত-গন্ধ করা। লাও ছাড়। চল এখুনি যাব কলকাতা—নিয়ে আসব হামিদনকে। ছাড়।

কুমারকে টেনে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন রাজাসাহেব।

কাঞ্চন এবার ক্ষতবিক্ষত দেহে উপুড় হয়ে পড়েছে ফরাশটার উপর।

*　　　*　　　*

কথাটা রাজাসাহেব হয়তো তাঁদের মতে ঠিকই বলেছিলেন। তারা হয়তো থুতুই বটে। কিন্তু ওরা যে থুতু চেটেই আনন্দ পায়

তাতে সন্দেহ নেই। সে সত্যটা ওরা বুঝেও বুঝতে চায় না। সংসারে যারা মানুষকে ঘৃণা করে এই কথা বলে, তাদের থেকে হীন মানুষ সৃষ্টিতে নেই। তারাই কলুষিত করেছে ভগবানের পৃথিবীকে, গোবিন্দের সংসারকে। কিন্তু আসল কথাটা কি জান কাঞ্চন—আসল কথাটা হল থানা পুলিস।

কথাটা পরে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তিনি—অর্থাৎ বোস সাহেব—তার গুরু, তার ভালবাসার বিগ্রহ। বলেছিলেন—কুমারসাহেব আগে একটা খুন করেছিলেন প্রথম জীবনে। তখন ষোল সতের বছর বয়স। এই দেশের একটি বুনোমেয়েকে নিয়ে মত্ত হয়েছিলেন। সে মেয়েটিও তাঁকে ভালবেসেছিল। তাকে রেখেওছিলেন রাজবাড়িতে। তখন বাগানবাড়ি হয়নি। একদিন মেয়েটির কয়েকজন আত্মীয় এসেছিল মেয়েটির কাছে। তার মধ্যে ছিল একটি আকর্ষণীয়া মেয়ে। কুমার ক্ষেপলেন তাকে দেখে। এবং মেয়েটিকেই বললেন—নিয়ে আয় ডেকে ঘরের মধ্যে। তিনজনে বসে বিলাতি মদ খাব। বুনোমেয়েরা হাড়িয়া খায়, খেতে ভালবাসে। মদে লোভ আছে। তার উপর বিলাতি মদ। এ মেয়েটিও সন্দেহ করে নি—ও মেয়েটিও না। তারপর মদ খানিকটা পেটে পড়তেই কুমারের খোলস খসল। ঘরে খিল দিয়ে—ওই মেয়েটির সামনেই এই নতুন মেয়ের উপর ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু এ মেয়েও বুনোমেয়ে। কুমার চিতাবাঘ—মেয়েটা বন্যশূকরী। সেও ঝাঁপ দিল কুমারের উপর। তারপর—কিসের মধ্যে কি হল—মেয়েটা খুন হয়ে গেল। জেলাটা তো জান—নন-রেগুলেটেড এলাকা। ধরলে ডেপুটি কমিশনার। তিনি অনেক কষ্টে খালাস পেলেন। অনেক টাকা গেল। ওই কুমারেরই রাজা হবার কথা। এতেই স্থির হল—রাজা এ কখনও হবে না। আরও কথা হল—ভবিষ্যতে কুমার যদি এই ধরনের কোন অপরাধ করেন তবে সরকার আর কোন বিবেচনা তো করবেই না, বরং নিষ্ঠুর সাজা দেবে।

রাজাসাহেব কাঞ্চনের মায়ের কাছে খবর পেয়েই ছুটে গিয়েছিলেন। তিনি জানতেন কুমারের মেজাজ। কাঞ্চনও জানত না। জানলে এইভাবে জেদ ধরে দাঁড়াতে পারত কি না এ প্রশ্ন অন্য কেউ করে নি, কাঞ্চন নিজেই করেছিল। করেই আবার হেসেছিল। সোনার হরিণের পিছন ধরে যে ছোটে বা ছুটবার নেশায় যে ঘর থেকে ছুটে বেরুতে যায়—তার সম্মুখে সেই বের হবার মুহূর্তটিতেই যদি রাক্ষস ভয়ংকর মূর্তিতে দাঁড়ায় তবে সে কি করে? ভয়ে পিছন ফিরে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে খিল দেয়? না—কি করে?

হায় হায় হায়।

পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর ভুবনে গড়িল কে।

পরান ছাড়িলে পিরিতি না ছাড়ে তিতায় তিতিল দে।

ওই পিরিতি—ওই প্রেমই সেই সোনার হরিণের নেশা। সোনার হরিণ মানুষ নয়—জন্মজন্মান্তরের মনের মানুষ। ধ্যানের ধন। মনের মানুষ মনেই থাকে—হঠাৎ কোন এক জন্মে সে বাইরে এসে কোন ভাললাগা মানুষের সঙ্গে এক হয়ে মিশে যায়। প্রেম মৃত্যুঞ্জয়, প্রেম অমৃত, প্রেম গঙ্গাসাগর-সঙ্গম। ওতে যে ডুবতে পারে তার মৃত্যু নেই, সে অমর, তার সকল মনস্কামনা পূর্ণ হয়—অপূর্ণ থাকে না। অশুচিকে শুচি করে, মর্ত্যকে স্বর্গ করে, সকল গ্লানি নাশ করে রে মুক্তো! আমার জীবনে এই ঘটেছে, আমার মরতে খেদ নেই, নরকের ভয় নেই—স্বর্গে আমি যাবই; কোন বাসনা অপূর্ণ নেই। ভক্তে আমাকে প্রণাম করেছে, পুণ্যাত্মারা আমাকে আশীর্বাদ করেছে—পাপাত্মা দুরাত্মা সংসারে কেউ জন্মায় না, কর্মদোষে পাপসংসর্গ ঘটে—দুষ্ট কাজ করে—তেমন লোক তারাও আমাকে ভালবেসেছে; হিংসে করতে গিয়েও করে নি। সবের মূলধন আমার ওই। মানুষকে ভালবাসলাম, সে মানুষে আর ভগবানে ভেদ রইল না, আমার ভগবানকে ভালবাসা হয়ে গেল। জীবনে যাকে পাই নি মরণে তাকে পাবই।

দেহে রোগ—সম্মুখে মৃত্যু—জীবনের ভাবাবেগ মুক্তধারায় বেরিয়ে আসছিল। ডাক্তারেরা বেশী কথা বলতে বারণ করেছিল—সে কথা কাঞ্চনের মেনে চলবার সাধ্য ছিল না। মেয়ে মুক্তো কচি মেয়ে; ও যদি তার মায়ের মত পরিবেষ্টনীতে ও সংস্কারে মানুষ হত তবে এরই মধ্যে অনেক শিখত, অনেক জানত, অনেক বুঝত। দেহ-ব্যবসায়িনীর ঘরের পরিবেশ ও সংস্কার অত্যন্ত বাস্তব, কঠিনতম ভাবে নিষ্ঠুর; রাত্রে তাদের ঘরে যত বাতি জ্বলে, যত রঙের ফুল ফোটে, যত ধনসম্পদ লুটিয়ে যায়—উড়ে যায়—সকালে তার কিছু থাকে না। এতে প্রথম বয়সে ওরা নিশ্চয় দুঃখ পায়—আঘাত লাগে; এ-জীবনে ঢুকবার আগে থেকে এসব শিক্ষা দেখে দেখে, শুনে শুনে পাওয়া সত্ত্বেও দুঃখ লাগে—কিন্তু তাতে তারা ভেঙে পড়ে না, প্রথম দু দশ দিন পরেই সয়ে যায়, তখন ওরা এতেও হাসতে শেখে—সে-হাসি যেমন তেমন হাসি নয়, ব্যঙ্গকৌতুকের হাসি। কাঞ্চনও সে শিক্ষা পেয়েছিল কিন্তু মুক্তামালা পায় নি! মায়ের কথা শুনতে শুনতে যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

বিবর্ণমুখে সে বললে—থাক মা থাক, আর বলো না। আর বলো না।

হাসলে কাঞ্চন। বললে—শোন মা, শুনতে হয়—শুনতে হবে। রাত্রির কথা—দুঃখের কথা—পাপের কথা শেষ হয়ে এসেছে। দিনের কথা এল। আর দুঃখ নেই। এটুকু না শুনলে মনে বল পাবি কোথা থেকে, কেমন করে?

কুমারসাহেব ভয় পেয়েছিলেন ভাইপো রাজাসাহেবের কথায়। আবার যখন হামিদনকে রাখবার কথা বললেন তখন তার সঙ্গে

পেলেন উৎসাহ সান্ত্বনা। আসল জ্বালা তো তাঁর কাঞ্চন থাকছে না বলে নয়, আসল জ্বালা হামিদনকে পাচ্ছিলেন না বলে। সব রাগ তাঁর জল হয়ে গেল, ঠিক হল—সেই রাত্রেই যাবেন কলকাতা বরাবর মোটরে চেপে।

কাঞ্চন বলল—আমাকে বললে এক হাজার টাকা নগদ পাবি—নিজের গয়নাগাঁটি পাবি, নিয়ে কাল পর্যন্ত থেকে চলে যাবি। বেঁচে গেলি!

রাজাসাহেব বললেন—না। এখন এক মাস আটক রইল—বরং আমার বাগানে চাঁপার কাছে থাকবেক। পিঠের দাগগুলা মিলাক আগে। ভূপীন্দর সিংকে বলে দিছি সে তার চাপান-টাপান লাগায়ে দাগগুলানের বেবস্থা করুক।

সে কাল ছিল আলাদা মুক্তো। ভূপীন্দর সিং ওই বাড়িতে ছিল—ওই একটি কাজের জন্যে। ওর একটি বিদ্যে ছিল—সে বিদ্যেটি হল নানান পাহাড়ী গাছগাছড়ার ওষুদের বিদ্যে। ওই গাছগাছড়ার বিষবড়ি দিয়ে জানোয়ার মানুষ সব মারতে পারত। সব থেকে বড় কাজ ছিল দুটি—রাজা কুমারের হুকুমে সে নষ্ট করত সেই সব সন্তানদের যাদের এঁরা মাটির ধুলো ছুঁতে বা আলো দেখতে দিতে চাইতেন না; আর একটি হল—মারপিট হয়ে দাগরাজি হলে—কালসিটে পড়লে—প্রলেপ চাপিয়ে দিন দুয়েক রেখে ধুয়ে দিলে বুঝবার জোই থাকত না যে সেখানে কেউ আঙুল দিয়েও টোকা মেরেছে। রাজারা মারপিট করত—ভূপীন্দর প্রলেপ লাগিয়ে দাগ মিলিয়ে দিত। বেমালুম মিলিয়ে দিত। কিন্তু মুক্তো, কেটে গেলে সে দাগ মাংস কেটে বসে; তার দাগ যায় না রে; এই দেখ—এই থুতনিতে। এই দেখ এই উপর হাতে।

হাসল কাঞ্চন।

এক মাস নয়, এক সপ্তাহ আটক ছিলাম।

রাজাসাহেব বলেছিলেন তাই ছিলাম। বলেছিলেন—এতকাল ছিলি কাঞ্চন এই ভাবে যায় না, যাস নে।

আমি বলেছিলাম—রাজাসাহেব, ভগবানের মন্দিরে নিয়ে চলুন—সেখানে মন্দিরে হাত রেখে বলছি—আমি কারুর কাছে কোন নালিশ করব না। নালিশ যে করাবে সে তো এখানে—মা।

—আর একজন যে আছে রে।

—না। বিশ্বাস করুন রাজাসাহেব, তিনি বিন্দুবিসর্গ জানেন না। তিনি ভুলেও আমার দিকে এ মন নিয়ে তাকান নি। তাঁর সঙ্গে কোন কথা হয় নি, কোন ইশারা না! রাজাসাহেব, আমি তাঁকে পাবার আশাও করি না। তবু—তবু মন মানছে না। আকাশের চাঁদ দেখে অনবুঝ মন যেন হাত বাড়ায়, এ হাত বাড়ান আমার তেমনি।

রাজাসাহেব বলেছিলেন—হুঁ—তাইতো বড় তাজ্জব লাগছিল হে। বোস উকীলের নামটি তো অনেকদিন থেকে জানা বটে। উকীল খুব বড় নয়—তবে নিন্দের নয়। কিন্তুক মানুষটি ভাল বলে যে সবাই সুখ্যেত করে হে। তবে—তবে ইটা কি হল ?—হঁ। শুনলম যখন তখন তাই মনে হল হে কাঞ্চন। ভাবলম কি জান—হুঁ হুঁ বাবা মাছ সব পাখপাখুরীতেই খায় গ, ধরা শুধু পড়ে মাছরাঙাগুলা! তাই বল! ই তো তু কি বলে বিল্বমঙ্গল হয়ে যাবি গ! এঁ্যা। তা যা, হাঙ্গামা হুজ্জুত করবি না জানি। চাঁপা রইছে ঐ খানে, তুর মায়েরও সাহস হবে নাই! তা যা। এখুন তার সঙ্গে বুঝাপড়া করগা। কাকাও লিখেছে—বিদেয় করতে তুকে। সে হামিদনকে নিয়ে আসবেক।

কুমারসাহেবের চাবুকের জ্বালা আমার সব চেয়ে বড় জ্বালা নয়, তার হাতে খুন হবার ভয়ও বড় ভয় নয়, তার চেয়েও বড় জ্বালা এর পরে; আমার মায়ের কথার জ্বালা—বিষ দিয়ে মেরে দেবার ভয়, ওষুদ খাইয়ে গলা নষ্ট করে দেবার ভয়।

এলাম কলকাতা। কলকাতায় আশ্রয় মায়ের আশ্রয়। মা বাড়ি করেছে আমাদের দুই বোনের পাপের টাকায়, কিন্তু সে বাড়ি তো তার।

নিজের মা, গর্ভে ধরেছে—মানুষ করেছে, অবিশ্বাস তো করি নি। মুখে মা বলেছিল—ঝাঁটা মেরে বিদেয় করব কিন্তু নিজের মা কি তাই পারে—এই ভেবে মনে মনে হেসেই বাড়ি এসেছিলাম। মা সঙ্গেই এসেছিল লালপাহাড়ী থেকে। পথে মুখ ভার করেই এসেছিল। কিন্তু লোকসান ভবিষ্যতের হিসেবে যত হোক—তখন আমার গায়ে গয়না—হাজার তিনেকের, আসবার সময় হাজার টাকা নগদ, পিঠের চামড়ার দাগ—এ তো ছিল। এ নিয়ে তখনকার দিনে কলকাতাতেও দু তিন বছরের জন্যে ভাবনা হবার কথা নয়। মা বলেছিল—চল আবার থিয়েটারে ঢুকবি।

আমি বলেছিলাম—না। ও আর আমার হবে না।

—হবে। মোটা একটু হয়েছিস—বসে খেয়ে খেয়ে। খাওয়া কম কর আর ফের নাচ অভ্যেস কর। শরীর হাল্কা হয়ে যাবে।

—না।

মা কুচ্ছিৎ কথা বলেছিল—আমার দেহের ব্যাখ্যান করে।

আমি কথা বলি নি!

ক'দিন পর মা ডেকে বলেছিল—আজ দালাল এসেছিল, বলে গিয়েছে—কয়লাকুটির বাবুরা ক'জনা আসবে। তারা লালপাহাড়ীতে কুমারের মাইফেলে তোকে দেখেছে। আমি বলেছি ঘণ্টা ধরে কারবার আমার মেয়ের। প্রথম ঘণ্টা একশো বলব পঁচাত্তর নেব—তারপর তিরিশ টাকা করে ঘণ্টা।

আমি বলেছিলাম—না।

—না! বাঘিনীর মত গর্জে উঠেছিল মা।

—হ্যাঁ, না। বলেছি তো বারবার। কতবার বলব?

—তোকে পুষবে কে? আমি পারব না। বেরিয়ে যা—

—যাব। কালই চলে যাব।

—আজই যা, এখুনি যা। এই মুহূর্তে।

মুক্তো, আমি আর সইতে পারি নি রে। আমার রাগ হয়ে গিয়েছিল। আমার রোজগারের টাকা সে তো মাকেই দিয়েছি। সেই তো সব নিয়েছে। কুমারের কাছে ছিলাম, মাসকাবারে টাকা পেতাম —সব পাঠাতাম মাকে। আমি চাঁপা দুজনেই পাঠিয়েছি। মা বুঝিয়েছিল, টাকা নিজের কাছে রাখিস নে—গয়নাও না, নেহাত যা না-হলে নয় তাই রাখবি কাছে—আর কিছু রাখবি নে। খানকী কসবীর জীবন—পদ্মপত্রের জল। এই আছে এই নেই। তাছাড়া কবে কি হয় কে জানে! ধর ঝগড়া হল ঝাঁটি হল—রাজারাজড়ার ব্যাপার —গলায় ধরে বের করে দিলে—এক কাপড়ে। কি করবি? কি করবি? আমার কাছে থাকবে—আমি যার যা আলাদা আলাদা চিহ্নিত করে রাখব। মা নিজের জীবন ভাড়ার বাড়িতে কাটিয়েছে। আমরা দুজনে বড় হলাম—রোজগার শুরু হল; বছর দুয়েকের মধ্যে মা বাড়ি কিনেছিল—ছোট বাড়ি। তারপর ভাগ্য খুলল—রাজা কুমারের নজরে পড়ে। সে পুরনো বাড়ি বেচে নতুন বাড়ি হল। এ বাড়ি সেই বাড়ি। মা বেরিয়ে যেতে বললে সেই বাড়ি থেকে। আমি ছুটে উপরে গেলাম—আমার টাকা গয়না বের করে নেব আলমারি থেকে—খান কয়েক কাপড় নেব—নিয়ে চলে যাব।

আলমারিতে হাত দিয়েছি—আঁচলের খুঁটে বাঁধা চাবি পরিয়েছি, মা পিছন থেকে এসে খপ করে চাবির রিঙ চেপে ধরে খুলে নিয়ে— আমাকে ধাক্কা দিয়ে বললে—বেরো, বেরো এখুনি, বেরো বাড়ি থেকে। ঘরের দরজায় মায়ের অনুচরটা। সে এক বদমাশ গুণ্ডা। ঘর সংসার ছেড়ে অনেককাল আগে মায়ের ঘরে বাসা গেড়েছিল। এককালে সে পারত সব। এ কালে বয়স হয়ে মায়ের বাড়ির কর্তা হয়ে

ভদ্রলোকের মত কাপড় জামা পরলেও প্রয়োজনে পুরনো মানুষ বের হয়ে আসত। সে মাকে টেনে বের করে নিয়ে আমাকে ঘরে বন্ধ করে শেকল দিলে। তিন দিন ভরে রেখেছিল। খেতে দেয় নি। আমি হাঁ না বললে খেতে দেবে না।

তিন দিন পর—একদিন—পেলাম সুযোগ।

সেদিন ওরা দুজনেই খেয়েছিল মদ। এই জীবনে মুক্তো মধ্যে মধ্যে মদ খাওয়ার পাগল পালা আসে। মদ নিত্যই খেত। হঠাৎ একদিন পরিমাণ, সময় সবের ছেদ মুছে দিয়ে বোতলের পর বোতল দিন রাত্রি খেয়ে চলত। খেতে খেতে মারামারি হত। মারামারি না হলে বেহুঁশ হয়ে পড়ত; হুঁশ হলেই আবার শুরু হত—দু দিন তিন দিন; তারপর ক্ষান্ত হত। এমনি সে দিন সকাল থেকে শুরু হয়ে সন্ধ্যেবেলা হল দুজনের ঝগড়া। প্রচণ্ড ঝগড়া। সেই ঝগড়ার মধ্যে মায়ের অনুচরটি দিলে আমার ঘরের শিকল খুলে। আমি পালালাম। তখন বিকেলবেলা। রাস্তায় বেরিয়ে চলেই ছিলাম; কোথায় যাব ঠিকানা ছিল না। পথে পথে। সম্বলের মধ্যে আট টাকা দশ আনা —একটা কাচের বাটিতে আমার ড্রয়ারে ছিল—সেটা মা জানত না— সরাতে পারে নি; নইলে প্রথম যেদিন আমাকে ঘরে বন্ধ করে সেই দিনই সে আমার গায়ের গয়না হাতের চুড়ি পর্যন্ত খুলে নিয়েছিল। আঙুলে থেকে গিয়েছিল একটা আংটি। একটা রিক্‌শায় চেপে বললাম—চল্‌। একবার ভাবলাম থিয়েটারে যাই। একবার ভাবলাম থিয়েটারের কোন বন্ধুর কাছে যাই। কিন্তু কি করে পরিত্রাণ পাব মায়ের হাত থেকে কলকাতায় কোথাও গিয়ে। মুখ দিয়ে বের হল— হাবড়া পুলের পাশে জগন্নাথঘাট। রিক্‌শাওয়ালাকেও বিশ্বাস করতে পারি নি। জগন্নাথঘাটে নেমে হেঁটে পুল পার হয়ে স্টেশনে এলাম।

স্টেশনে এসে বর্ধমানের টিকিট কাটলাম।

বর্ধমানে এসে কিন্তু তাঁর কাছে যাবার ভরসা হল না। কি বলে

যাব ? কি বলব—ভালবেসে এসেছি আমাকে আশ্রয় দাও। কিন্তু সে তো বলবে—সে কি ? তুমি ভালবাস কিন্তু আমি তো—।

তিনি যে মানুষ—তিনি তো মুখে বলতে পারবেন না—ভালবাসি না। থেমে যাবেন একটু—বেদনার হাসি হাসবেন! তারপর বলবেন—তুমি সমুদ্রমন্থন করা বিষ—এ গলায় রাখতে পারেন যিনি তিনি আমি নই। সে শক্তি তো আমার নেই। তখন আমি কি বলব ? কি করব ? পৃথিবীকে দুভাগ হতে বললেও পৃথিবী তা হবে না—আমি কোথায় গিয়ে লুকোব ?

পড়ে রইলাম বর্ধমানে সারারাত।

আকাশপাতাল ঘুরলাম মনে মনে। কোথায় যাব ? মনে মনে গোবিন্দকে ডাকলাল—বললাম—যাকে ভালোবাসলাম তাকে তো রূপ দেখে শুধু ভালবাসিনি, ভালবাসার মূলকথা—তাঁর মুখে তোমার নাম গান শুনে। তোমাকে ভালবেসে সে কাঁদল—সেই কান্নার ছোঁয়াচ লেগে আমি কাঁদলাম। তুমি বলে দাও কোথা যাই ?

মনে মনে কূলকিনারা না-পেয়ে মুসাফেরখানায় অনেক কাঁদলাম। সকালবেলা মনে হল চাঁপার কাছে যাই, তারপর ভেবে ঠিক করব কোথায় যাব। দশটার সময় চড়লাম লালপাহাড়ীর ট্রেনে।

কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছিলাম! চারিদিক কূলকিনারাহীন বলেই নয়; যার জন্যে এত, তার দোর থেকে ফিরে এলাম। ঢুকতে ভরসা হল না, বল পেলাম না! সে আমাকে ভালবাসুক না-বাসুক—আমি তো তাকে ভালবাসি! গিয়ে সেই কথাটা বলেও আসতে পারলাম না। মুক্তো—ভাবতে ভাবতে নেমে পড়লাম আসানসোলে। বেলা তখন দুটো। ফিরে যাব, বর্ধমানেই ফিরে যাব। কিন্তু হাতে টাকা কই ? আট টাকার পাঁচ টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। ভুলের উপর ভুল করলাম—আসানসোলে নেমে লালপাহাড়ী যাবার টিকিটখানা

টিকিট কলেক্টরকে দিয়ে বেরিয়ে এলাম মুসাফেরখানায়। বর্ধমানের টিকিট করতে গিয়ে আবার কে যেন হাত চেপে ধরল।

আমি বেশ্যার মেয়ে, আমি পতিত—আমি নরকের কীট—কি করে যাব—কোন অধিকারে সেই পুণ্যাত্মার বাড়ি গিয়ে তাঁর পুণ্য অঙ্গে আমার নরকের পাঁকের ছাপ লাগিয়ে দিয়ে আসব? টিকিট করতে গিয়ে করতে পারলাম না, ফিরে এলাম। চুপ করে একপাশে বসে রইলাম। বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ বুঝতে পারলাম—বিপদে পড়েছি। বেলা পড়ে এসেছে, শীতের দিন; সন্ধ্যে হয় হয়। বয়সে তখন যুবতী; তার সঙ্গে রূপ ছিল; সে রূপকে সাজানো মাজাঘষাই তো শুধু জীবনের কাজ; যৌবন রূপ এই তো ছিল জীবনের ব্যবসার মূলধন; মাজাঘষা রুপোর বাসনের ঝকমকানি—ধুলোতে দু চার দিন পড়ে থাকলে তো যায় না; ক দিনের অযত্নে তা আমারও যায় নি। চুল বেঁধেছি কত বাহার করে—পাতা কাটার কাল তখন, পাতা কেটে কেটে চুলে একটা ছাঁদ হয়ে গিয়েছিল—তাই বা যাবে কোথায়? ধূলোমাখা চুলের মধ্যে তাও ছিল। দেখলাম—লোকের চোখ পড়েছে আমার উপর, তারা ঘুরছে-ফিরছে। শিস কাটছে। নিজেদের মধ্যে ইশারা করছে। ভয়ে শিউরে উঠলাম। লালপাহাড়ীতে ছিলাম—আসানসোলের কথা শুনেছিলাম।

আসানসোলে পয়সা অনেক—পাপ অনেক—পাপী অনেক। এখানে দেশদেশান্তরের গুণ্ডা ডাকাত গোপন আড্ডা গেড়ে থাকে। ভয় পেয়ে মুসাফেরখানা থেকে স্টেশন প্লাটফর্মে যাব বলে উঠলাম। হঠাৎ পুলিস এসে পথ আটকাল। খাকী পোশাক পরা ভদ্রলোক—বললে—থানায় যেতে হবে তোমাকে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কেন?

বললে—তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ। চল থানায় চল। এজাহার দিতে হবে।

আমি বললাম—আমি লালপাহাড়ী রাজবাড়ি যাব। সেখানে আমার বোন আছে। আমি ভুল করে নেমে পড়েছি। পরের ট্রেনে যাব। আমি থানায় যাব কেন?

—যেতে হবে। আমরাই তোমার বোনকে খবর দেব। ওঠ ওঠ। নইলে কনেস্টবল ডাকতে হবে। ওঠ।

কি করব? ভগবানকে ডাকলাম। আবার মনে হল ভালই হল—দুষ্টু লোকের হাত থেকে তো বাঁচলাম! রাত্রিটা তো থানায় থাকতে পাব! কিন্তু তখন কি জানি—?

তখন জানতাম না—মুক্তো—যে ওরা পুলিস নয়। পাষণ্ডেরা পুলিস সেজে এসেছে। আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে—।

একখানা ঘোড়ার গাড়িতে চড়িয়ে আমাকে—।

ওঃ বনে এত জন্তুজানোয়ার নেই, নরকে এত অন্ধকার নেই মুক্তো, এত প্রহার নেই, এত ভয় নেই! তারা পাঁচজন। কি ভয়ংকর তাদের হাসি—কি জ্বালা দাহ তাদের স্পর্শে! আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

পরের দিন পুলিস আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় পেয়েছিল রাস্তার ধারে। রক্তাক্ত দেহ! দেহটার উপর আর অত্যাচারের শেষ ছিল না।

একটু চুপ করে গেল কাঞ্চন। মুক্তো অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার মা বলে চলেছে এই সব কথা—তাকে—তার পেটের মেয়েকে বলে চলেছে—কিন্তু কোন অনুশোচনা নেই কোন দুঃখ নেই—কোন ক্ষোভ নেই—খেদ নেই।

কাঞ্চন আবার বললে—ভগবান আমাকে ওই চরম শাস্তি দিলেন। বললেন—যাকে ভালবেসেছিস তার দেহের জন্যে যে লোভ তোর তার শাস্তি এই নে। তোর দেহের পাপের চরম শাস্তি দিলাম। সে দিন বুঝিনি মুক্তো—পরে বুঝেছি।

তিন

সে মামলা বিখ্যাত মামলা আসানসোলে।

খবরের কাগজে মস্ত হৈ-চৈ।

কাঞ্চন কিছু গোপন করে নি। সব বলেছিল। সব অকপটে। সে বেশ্যার মেয়ে। বেশ্যাবৃত্তিই করে এসেছে। চৌদ্দ বছরে শুরু করেছিল—আজ চব্বিশ বছর। অর্থ ছাড়া কিছু চায় নি। ভোগ ছাড়া বোঝে নি। মদে ছিল প্রবল লোভ। দেহ ভোগের কামনা—বহু পুরুষের সঙ্গ-লালসা ছিল বিলাস; ওই ছিল সুখ। হঠাৎ কি হল তার। সমস্ততে তার অরুচি হল। এ জীবন মনে হল কণ্টকশয্যা। মনে হল—এই বিলাস এই ভোগে যেন বড় অশান্তি, বড় জ্বালা।

সে গোপন করলে না—সে একজনকে ভালবাসলে। ভালবাসলে—তার গান শুনে। কীর্তন গান শুনে। কীর্তন গান শুনে সে কেঁদেছিল—অনেক কেঁদেছিল। তারই সঙ্গে সব যেন গলে ধুয়ে মুছে গেল। সে ঠিক করলে এই পাপ সে আর করবে না। সে মস্ত এক বড় লোকের কাছে ছিল—তার আশ্রয় ছাড়লে; তার মা এর জন্যে তার গয়নাগাঁটি কেড়ে নিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিলে, সে পথে বের হল।

যে-জনকে সে ভালবাসে তার কাছে সে যায় নি—তার নাম কলঙ্কিত হবে ব'লে। কোথায় বেরিয়েছিল তার ঠিক ছিল না। বেরিয়েছিল পরিত্রাণ পেতে তার মা'র চাপানো এই পাপ ব্যবসা এই ঘৃণিত জীবন থেকে। কিন্তু পৃথিবীতে পাপী ব্যভিচারী সমাজ-বিরোধী কুৎসিত ভয়ংকর মানুষ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। পঙ্ককুণ্ড করে রেখেছে পৃথিবীকে। তারা পথে এই অসহায়া মেয়েটিকে রক্ষকের

ছদ্মবেশে অপহরণ করে তার উপর পৈশাচিক অত্যাচার করেছে। মেয়েটি হাসপাতালে সংকটাপন্ন অবস্থায় রয়েছে। পুলিস জোর তদন্ত করছে।

খবরের কাগজে ফলাও করে সংবাদ ছাপা হয়েছিল। তার ছবি সমেত।

সে সব প্রকাশ করেছিল—কিন্তু তাঁর নাম প্রকাশ করে নি; কুমারের নামও সে বলে নি।

কুমার কিন্তু এসেছিলেন।

এসে বসে বলেছিলেন—হুঁ। তু একটো দেখালি বটে কাঞ্চন।

হুঁ। তা—খুব ভাল লাগছেক রে—! হুঁ খুব ভাল লাগল আমার। পুলিস বল্‌বেক—

কাঞ্চন বলেছিল—আমি তো আপনার নাম করি নি কুমারসাহেব।

হেসে কুমার বলেছিলেন—তু করিস নাই কিন্তুক পুলিসের কাছে কি ছাপি থাকে গ? উয়ারা একটুকুন গন্ধ পেলে—নাড়ি নক্ষত্র সব টেনে টুনে ঠিক বার করবেক। তুর মায়ের নাম তো শুনেছে। ব্যস আর কি চাই? সব জেনেছে, তুর বোসবাবুর নাম সমেত; হুঁ তাও জেনেছে উরা।

কাঞ্চন বলেছিল—না—না—কুমারসাহেব—

—হুঁ। সে নাম উঠবে নাই—সি ভয় তু করিস নাই। আমার লাজলজ্জা নাই কাঞ্চন। আমি সিধা মানুষ। বেটাছেলে পয়সা আছে—করি—করি। হুঁ—বেআইনী হয় দাও সাজা দাও। মামলা কর। পাপটাপ উসব আমি বুঝাপড়া করব ঠাকুরদেবতার সঙ্গে। কিন্তু রাজাসাহেব বলে—না। মামলাতে নামটাম উঠলে চলবে নাই উ চাপা দাও। টাকা দিয়া চেপ্যা দাও হে। হুকুম হয়ে গেছে। আমাদের নাম চাপা পড়লে বোস উকীলের নামও চাপা পড়বেক।

তবে আমি যাব উয়ার কাছে। বলব—কি হল দেখ। ইটার লেগে দায় তুমার আছে কি না বল!

কাঞ্চন আকুতিভরে বলে উঠেছিল—না—না কুমারসাহেব না। আপনার পায়ে ধরছি।

অনেকক্ষণ অভিভূতের মত বসে থেকে কুমার বলেছিলেন—তু আমার কাছে কিছু চেঁয়ে লে কাঞ্চন। আমি তুকে দোব। দিতে আমার খুব সাধ হছে রে!

একটু হেসে কাঞ্চন বলেছিল—কি নেব? বলুন কি দেবেন? যা দেবেন তাই নেব আমি!

—বেশ। আমার মন হছে কাঞ্চন তুকে আমি বর্ধমানে একটা ছোটখাটো বাড়ি কিনে দি। আর তিরিশ টাকা করে মাসে দিব। তু বর্ধমানে থাক। মাসে একদিন করে তু লালপাহাড়ী আসবি, এই পূন্নিমেতে পূন্নিমেতে—। কীত্তনে তুর মন গলেছে—তু ঠাকুরকে কীত্তন শুনায়ে যাবি।

কেঁদে ফেলেছিল কাঞ্চন।

বলেছিল—আপনি আমার সত্যি রাজা। রাজা নয় বাদশা। নইলে দাসী বাঁদীকে এত দয়া করে কে? নোব—কুমারসাহেব নোব। আপনি যখন ডাকবেন—যাব। তবে—

হাত জোড় করে বলেছিল—মদ খাব না। নাচব না।

—বেশ কথা রইল!

কুমার চলে গিয়েছিলেন।

দিন সাতেক পর, তখন কাঞ্চন সুস্থ হয়েছে অনেকটা। কুমার-সাহেব এলেন দলিল নিয়ে। বর্ধমানে বাড়ির দলিল। তিন হাজার টাকায় ছোট একটি বাড়ি—একটি পুকুরের পাড়ে। তিনি একা নন—সঙ্গে কাঞ্চনের প্রিয়তম মানুষটি। বোসবাবুকেও নিয়ে এসেছেন।

এ দলিলের কারবার তাঁর হাত দিয়েই হয়েছে। স্থির গম্ভীর মুখে সারাক্ষণ বসে থাকলেন। বুঝতে পারলে না কাঞ্চন—তিনি বিরক্ত কি প্রসন্ন। কথাও বিশেষ বললেন না। ওই দুটো চারটে।

প্রথম কথা বললেন—এখন ভাল আছ ?

উত্তর দিতে গিয়ে কাঞ্চনের চোখে জল গড়িয়ে এল। মুখে কথা বলতে পারলে না—ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ।

এরপর কুমারসাহেব কলরব শুরু করে দিলেন। বিচিত্র মানুষ, প্রাণের উল্লাসে উচ্ছ্বাসে ভরা।—এই তুর দলিল। টাকা আমার, ওই বোসসাহেব করে দিয়েছেন। উকে বললাম—আমি মশায় মাথা গুঁজবার জাগা করে দিলম, ইবার মনের মাথা গুঁজবার বেবস্থা আপনাকে করতে হবেক। লইলে ধম্মে পতিত হতে হবে আপানাকে।

এরই মধ্যে দ্বিতীয় কথা বললেন তিনি—কাজটা ভাল কর নি তুমি। এই ভাবে ঘর থেকে পালিয়ে আসা—

সে চুপ করে ছিল।

তারপর তিনি আবার বললেন—বর্ধমানে যদি নামলে তবে তাই আমার ওখানে গেলে না কেন ?

তার ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছিল। বলতে পারে নি—আপনি ফিরিয়ে দিলে কি করতাম ? বলতে পারে নি—কি করে বলতাম—আপনাকে ভালবেসে আপনার কাছে এসেছি। দেহের ব্যবসা যারা করে তারা ছলনা করে অভিনয় করে বলতে পারে—গলা জড়িয়ে ধরে বলতে পারে—আমি তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু সত্যিই যখন ভালবাসে তারা তখন তা পারে না, মুখ থেকে ও কথা বের হয় না।

আবার তিনি বললেন—কি বিপদ ঘটালে বল তো ?

আবার কাঁদলে কাঞ্চন।

কুমার সাহেব এবার কলরব করে উঠলেন—সব তো আপনার লেগ্যা মশায়! হুঁ। আপুনি আবার বকতে লাগলেন।

হেসে তিনি বললেন—আমার জন্যে হলে সেটা আমার লজ্জা কুমারসাহেব। তবে কীর্তন শুনে কেঁদে যদি মনে হয়ে থাকে এ পাপ করব না—যাকে ভাল লেগেছে তাকেই ভালবাসব—তবে আলাদা কথা। তাতে আমারও কলঙ্ক নেই—ওরও পুণ্য আছে—মুক্তি আছে।

—উসব আপনাদের ভাল ভাল কথা, পুঁথির কথা, কেতাবের কথা। মানুষের কথা লয়। বুঝলেন! আপনাকে দেবতা বলে ভজেছে—

—মানুষকে দেবতা বলে ভজা ভুল কুমারসাহেব। দেবতা দেবতা, মানুষ মানুষ। তবে হ্যাঁ, মানুষের মধ্যেও দেবতা উঁকি মারে মধ্যে মধ্যে। ওর কাছে দেবতা উঁকি মেরেছে আপনার মধ্যে দিয়ে। আপনিই ওর সত্যিকারের পথ করে দিলেন। যা ব্যবস্থা করে দিলেন—তাতে যদি ও কীর্তন শিখে শুদ্ধভাবে পেটের ভাতটা জুটিয়ে জীবন কাটাতে পারে তবে ওর মুক্তি কেউ ঠেকাতে পারবে না।

—এই দ্যাখেন। আমার মত লোককে দেবতা বানায়ে দিলেন। একটা মাতালকে বেশ্যাখোরকে দেবতা! তা আপনারা সব পারেন মশায়—উকীল লোক—। হা-র্হা করে খানিকটা হেসে কুমার আবার বললেন—তা কীর্তন উ গাইবেক--তো শিখাবার ভারটো আপুনি লেন। মজালেন তো আপুনি গো! ওঃ কী গেঁয়েছিলেন—মাইরি—হ-হ-হ !

হেসেছিলেন একটু তিনি। বলেছিলেন—দেবতা নেই কোথায় কুমারসাহেব। সর্বত্র আছে—সবার মধ্যে আছে। নইলে সেই মেয়েটিই বা এই মেয়ে হয় কি করে? সব ছেড়ে পথে বের হয় কি করে? দেখুন ওর মধ্যে থেকে যে দেবতা বের হল তাকে মারবার জন্যে কিভাবে দল বেঁধে পিশাচরা জুটল—কি অত্যাচারটা করলে।

কিন্তু মরল সে? আর আপনি? তোষামোদ তো করি নে, সে জানেন আপনি। অনেক পাপ, অনেক গলদ আপনার আছে—আবার অনেক পুণ্যও অছে। শেষ পর্যন্ত কোন্‌টা টেঁকবে কোন্‌টা টেঁকবে না জানি না—তবে যদি দেবতা পাথর ফাটিয়ে বের হয় তবে সে দেবতা অনেক কিছু করবে দুনিয়ার জন্যে। আপনাদের রাজাসাহেব পারবেন না, আপনি পারবেন। সংসারে যারা হিসেবী তারা জীবনের ব্যালান্স শীটে হিসেব মিলিয়ে চলে; দেউলে হয়ে পিশাচও হয় না আবার পুণ্যের ক্রেডিটে পাহাড় তুলতেও পারে না।

কথাটা তিনি মিথ্যা বলেন নি। রাজাসাহেবই অনেক তদ্বির করে মামলাটাকে ধামাচাপা দিয়েছিলেন। আসামী পুলিশ বের করেছিল কিন্তু ওই তদ্বিরের ফলে তারাও খালাস হয়েছিল। তার কারণ ছিল—রাজসাহেবের হিসেব।

লালপাহাড়ী রাজবাড়ির অনেক কেলেঙ্কারি বের হবে। কুমারের নাম তো উঠবেই খবরের কাগজে, আদালতেও টানতে পারে। হয়তো কাঞ্চনের কাটা থুতনি পিঠের কাটা দাগও বের হতে পারে। কুমার বলেছিলেন—হোক ক্যানে হে, তাই হোক। তাই আদালতেই বলব। লাজ কিসের ইতে? আঃ! জানাজানি হল তো আমার বেগুনবাড়ি ভেসে গেল। কিসের কার ধার ধারি গ!

তবুও রাজাসাহেব হতে দেন নি।

কাঞ্চনকে হাসপাতাল থেকে কৃশ্চানদের আশ্রমে রাখা হয়েছিল! তার মা এসেছিল নিতে। কাঞ্চন যায় নি। রাজাসাহেব কাঞ্চনকে বলেছিলেন—শুন্‌ কাঞ্চন, তু লোকগুলানকে দেখে চিনতে পারলেও চিনিস না। বুঝলি! কুমারের কেলেঙ্কারি হবে—চাঁপা আমার কাছে রইছে—আমার হবে, বোসবাবুরও হবে। আর তুকে নিয়ে আদালতে খিস্তি করবেক রে!

সে-খিস্তির নমুনাও তিনি তাকে শুনিয়েছিলেন। লজ্জায় তার মাথা হেঁট হয়েছিল। বলেছিলেন—উয়ারা বলবেক কি জানিস? বলবেক তু নিজে গিয়েছিলি—টাকার লেগে। তু তো খানকীর বেটী খানকী। তুদের তো এই করণ— এই করে তো খাস!

সে বলেছিল—না—না রাজাসাহেব। কাজ নেই। আমি চিনব না। আমি চিনব না।

রাজা বলেছিলেন—হুঁ। তলে তুকে আমি কথা দিছি—উ শালার লোচ্চাদিগে আমি সাজা দিব। হুঁ। কঠিন সাজা দিব। তুকে ছামুতে রেখে সাজা দিব, তুর পায়ে ধরাব।

—না। তাতেও কাজ নেই রাজাবাহাদুর। সেও চাই না আমি। কাঞ্চন বলেছিল। মনে মনে সে বলেছিল—যে পাপ জীবনে করেছি এতদিন—এ আমার সেই পাপের সাজা। এতেই যেন তার মুক্তি হয়।

তাই হয়েছে মুক্তো। ওই সাজাতেই মুক্তি আমার হয়েছে।

এর পর আমার আরম্ভ হল নতুন জন্ম রে—নতুন জন্ম। বর্ধমানের বাড়িতে এসে শাক অন্নে দিন কাটাতে লাগলাম। উনি আমার কীর্ত্তন শেখার ব্যবস্থা করে দিলেন। বর্ধমানের রাজলক্ষ্মী ঢপ গাইত; ভাল গাইত। তার দলে দোহারকি করবার কাজ করে দিলেন। কিন্তু নিজে চলে গেলেন বর্ধমান থেকে। কথাটা চাপা থাকে নি। সংসারে কিছু মানুষ আছে মুক্তো, যারা দুনিয়াতে মিথ্যে অত্যাচারের প্রতিবাদ করে না, সয়েই যায়, বিশেষ করে তার সঙ্গে যদি কেউ স্নেহাস্পদ জড়ানো থাকে। এই মানুষটি সেই দলের মানুষের একজন, হয়তো বা তাদের মধ্যে সেরা মানুষ। যারা ভাগ্য মানে তারা বলে এরা এই ভাগ্য নিয়েই এসেছে। আমারও তাই বলতে ইচ্ছে হয়—ওঁর ভাগ্যই এই। ওঁর ভাগ্যে যে মেয়ে ওঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসবে সেই তাঁকে আঘাত করবে আর দুর্নামের ভাগী করবে।

একটু হেসেই কাঞ্চন মেয়েকে বললে—ঠাকুরদেবতাতে তোর

বিশ্বাস তো তেমন নেই মুক্তো, আমি তো জানি। কৃশ্চানদের ইস্কুলে তোর যখন পড়বার ব্যবস্থা উনি করে যান, তখন আমার মত ছিল না। কিন্তু ওঁর কথায় তো না আমি বলি নি কখনও। উপায়ও ছিল না। এখানকার ইস্কুলে নেবে না বলেছিল। নিলেও পাঁচজনে দশকথা কইত, সে সহ্য করা তো সহজ হত না।

মুক্তো হেসে বলেছিল—এতে আর ঠাকুরদেবতা বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা তুলছ কেন? ভাগ্য মানি আর না মানি যেমন মানুষের কথা বললে—বাবার কথা—তেমন মানুষ আছে—নিশ্চয় আছে। মিথ্যে দুর্নাম অপবাদ সহ্যই করে যায় চুপচাপ—প্রতিবাদ করে না; বরং মিষ্টি হাসি হাসে। আছে বই কি। তারা বড়মানুষ।

—না। তারা হল ভক্তমানুষ, ভগবানের কৃপা-হওয়া মানুষ। এইটেই তুই বিশ্বাস করবি কি না করবি—তাই বলছিলাম। জানিস মা—কলঙ্ক—মিথ্যে কলঙ্ক দিয়েই তো ভগবান সংসারের কাছ থেকে ভক্তকে আলাদা একা করে দিয়ে নিজেই তার সর্বস্ব হয়ে বসেন। দেখ—ওঁর দেখ। তাই হল। মানুষটা তো মনে মনে সন্ন্যাসীই ছিল। তবু কাজকর্ম করছিল—সংসারেই ছিল। ভগবান বললেন—দাঁড়া তোকে মজা দেখাচ্ছি। বলে আমার মত কলঙ্কিনীকে দিয়ে ভালবাসালেন—সংসারকে দিয়ে কাদা ছোঁড়ালেন—ঘর ছাড়ালেন।

কাউকে কিছু বললেন না; ওঁর কাছে যে অল্পবয়সী উকীল কাজ করত, কাজ শিখত তার হাতে কাজের ভার দিয়ে, 'কিছুদিন ঘুরে আসি, শরীর খারাপ' বলে চলে গেলেন; ওই উকীলই আমাকে মাসে কুড়ি টাকা করে দিত।

লালপাহাড়ীতে পূন্নিমেতে কেত্তন গাইতে যেতাম, তিরিশ টাকা হিসেবে পেতাম; উনি দিতেন কুড়ি, মধ্যে মধ্যে রোজগার হতো রাজলক্ষ্মী মায়ের সঙ্গে টপ গাইতে গেলে; চলে যেত।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কাঞ্চন বলেছিল—যা হল তার জন্যে দুঃখ

ছিল না মুক্তো—খেদ ছিল—খেদ হত আমার জন্যে ঘর ছাড়লেন উনি। আর আমি ওঁর জন্যে ঘর ছেড়েও ওঁকে পেলাম না। ভগবানকে ডাকতাম—নাম গান করতাম—মনে মনে ভগবানকে চাইতাম না, চাইতাম ওঁকে। তা'—। তা' সে চাওয়া আমার মিথ্যে হয় নি—ওঁকে পেলাম। কিন্তু সে কি পাওয়া মুক্তো! তার থেকে—।

চুপ করে গেল কাঞ্চনমালা। এত দীর্ঘ কাহিনী বলতে গিয়েও সে বারেকের জন্য এমন অভিভূত হয় নি। এমন অনর্গল ধারায় চোখ থেকে তার জল পড়ে নি এই দু দিনের মধ্যে। কিছুক্ষণ পর আত্মসম্বরণ করে সে বললে—তিন বছর পর ঝুলন পূর্ণিমার পরের পূর্ণিমায় লালপাহাড়ী গিয়েছি গান গাইতে। লালপাহাড়ীতে আমার থাকবার জায়গা করে দিয়েছিলেন ওঁরা ওই ঠাকুরবাড়ীতেই একপাশের একখানা ঘরে। নিরিবিলি ঘর। সন্ধ্যেবেলা ঘরে বসে তিলক আঁকছি—আসরে যাব, হঠাৎ লোক এসে খবর দিলে কুমারসাহেব কলকাতা থেকে একটু আগে এসেছেন—গেস্ট-হাউসে আছেন—খবর পাঠিয়েছেন যেন দেখা করি—আসরে যাবার আগেই।

বুঝলাম বরাত আছে। ফরমাশ কিছু হবে। গেস্ট-হাউস থেকে যখন ডাক এসেছে তখন গেস্ট আছে। হয়তো বরাত হবে বৈঠকী শোনাতে হবে। হয়তো বা গজল ঠুংরি—। কে জানে রাজারাজড়ার খেয়াল কখন কি হয়। হামিদনের রূপই আছে কিন্তু গাইতে সে ভাল জানে না। নাচে ভাল। তার নাচের সঙ্গে গাইতে হুকুম করবেন না তো? ভাবতে ভাবতেই গেলাম। ভরসার মধ্যে এই, তিন বছরের মধ্যে কুমার কথার খেলাপ করেন নি।

বারান্দায় কুমার দাঁড়িয়েছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন—আইচিস? আয়, কাকে এনেছি দেখ—। বোসবাবুকে ধরে নিয়ে আইচি। হঁ, কলকাতাতে দেখা।

বুকখানা ধড়াস করে উঠল, তারপর সে যেন খাঁচায় বদ্ধ, দম-বন্ধ-হওয়া পাখীর মত খাঁচার গায়ে ঝটপট করে মাথা কুটতে লাগল। হাত ঘেমে উঠল—পা কাঁপতে লাগল।

কুমার বলেই চলেছিলেন—শরীরটো খুব খারাপ করেছে বোস। সন্ন্যাসী হওয়া কি উয়ার সয়? তার উপরে যত সব আনখাই কথা। কলকাতার ডাক্তারগুলান ভালও বটে আবার মন্দও বটেক। যত সব—

ঘরের ভিতর থেকে সেই মুহূর্তটিতেই ঠিক তিনি এসে দরজায় দাঁড়ালেন—চাপা গলায় ডাকলেন—কাঞ্চন!

আমি পাথর হয়ে গেলাম মুক্তো।

সেই লম্বা মানুষ, রোগা হয়ে আরও লম্বা দেখাচ্ছে। মুখের সে লাবণ্য নেই—শ্রী নেই, সোনার মত বর্ণ—সেই বর্ণের উপর যেন কে কালি-মাখা হাত বুলিয়েছে; কালিপড়া চিমনির মধ্যে আলোর রঙ যেমন দেখায়—তাই। পরনে বহির্বাসের মত থান কাপড়, গায়ে একটা সাদা পাঞ্জাবি। সে মানুষই যেন নয়। আমার মুখে কথা ফুটল না; তিনিই আবার চাপা গলায় বললেন—ভাল আছ?

তারপর একটু হেসে বললেন—তোমাকে দেখে বড় ভাল লাগছে। সুন্দর হয়েছ তুমি। ধবধবে সাদা লালপেড়ে গরদ পরেছ—কপালে তিলক—চমৎকার লাগছে।

আমি লজ্জা পেলাম। যত লজ্জা তত আনন্দ।

মনে মনে সারা মন যেন বলে উঠল—সব তো তোমার জন্যে। তোমার ভাল লেগেছে—আমার সব সাজ সার্থক হয়েছে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললাম—কিন্তু আপনি? এ কি শরীর হয়েছে? কি হয়েছে আপনার?

চাপা গলাতেই বললেন—গলায় ক্যান্সার হয়েছে। মৃত্যু-ব্যাধি কাঞ্চন।

গলায় ক্যা-ন্সা-র। মৃত্যুব্যাধি।

তিনি বলে গেলেন—চাপা গলা শুনছ না? গলার এখন এই অবস্থা। গান গাইতাম বলে বোধ হয় অহংকার ছিল। তাই সে অহংকার তিনি চূর্ণ করে দিলেন। জল খেতেও যন্ত্রণা হয়। কলকাতা এসেছিলাম ডাক্তার দেখাতে। দেখা হল কুমারসাহেবের সঙ্গে। উনি বড় ভালবাসেন আমাকে। তোমার উপরেও মমতা খুব। জোর করে ধরে নিয়ে এলেন।

বলতে বলতে হাসলেন। হেসে এবার বললেন—ধরে নিয়ে এলেন—লালপাহাড়ীর জলহাওয়ায় উনি সব সারিয়ে দেবেন আমার। গাড়িতে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসা। আজ পূর্ণিমা—তুমি কীর্তন গাইবে। তুমি নাকি বড় ভাল গাইছ আজকাল। শুধু ভাল গাইছ না—গাইতে গাইতে কাঁদ, সঙ্গে সঙ্গে যারা শোনে তারাও কাঁদে। তাই শুনতে এলাম—কাঁদতে এলাম। গান শুনে কাঁদবার ভাগ্য তো সহজে হয় না; নিজে না কাঁদলে তো পরে কাঁদে না। কিন্তু গাইতে গাইতে কাঁদতে পারে এমন গাইয়ে কোথায়?

মুক্তো, গাইবার জন্যে অপেক্ষা করতে হয় নি—তখনই সেই মুহূর্ত থেকে কাঁদতে শুরু করেছিলাম। এ কি হল? এ কি দেখলাম? হে গোবিন্দ!

গোবিন্দ নাম করলে তোর মুখ অপ্রসন্ন হয় কেন মুক্তো? নামটা মিষ্টি লাগে না, অসভ্য মনে হয়, নয়? অনেকক্ষণ চুপ করে রইল কাঞ্চন কীর্তনওয়ালী। একটুকরা হাসি—হ্যাঁ একটুকরাই বটে—পড়ন্ত বেলায় অন্ধকারপ্রায় ঘরে পশ্চিম দেওয়ালের কোন একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে একটি রেখার মত একটু আলো যেমন পড়ে তেমনি সামান্য একটু হাসি তার রোগক্লিষ্ট মুখে ঠোঁটের রেখায় রেখায় ফুটে রইল।

একটু পর বললে—যাক—তোর যে নাম ভাল লাগে সেই নামেই তাকে ডাকিস। কিন্তু কাউকে ডাকিস। আজ জীবনে দেখছি তো ওই একটি নামই আছে—আর কিছু নেই—কিছুই নেই। তুইও নেই।

বলে চুপ করলে কাঞ্চন।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—সে দিন আমি সত্যিই প্রাণ ঢেলে কীর্তন গেয়েছিলাম। তিনি বসেছিলেন সামনে। চোখ বুজে কোলের উপর হাত দুটি রেখে ধ্যানী যোগীর মত। বন্ধ চোখ দুটির কোণ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছিল। মধ্যে মধ্যে আমার গলা বন্ধ হয়ে আসছিল—কান্নার জন্যে। উনি একবার বলেছিলেন—গান গাইতে গাইতে কাঁদবে—তাতে গলা বন্ধ হলে তো চলবে না। এ কান্না আনন্দের কান্না।

আমার সঙ্গে ছিল বর্ধমানের আর একটি মেয়ে—রাজলক্ষ্মী মায়েরই দলের মেয়ে। সেই আসর রেখেছিল আমার গলা বন্ধ হলে।

রাত্রে গান শেষ হল। আমি গোবিন্দকে প্রণাম করে ঘরে বসলাম। তিনি হেসে অনেক প্রশংসা করে চলে গেলেন। আমি থাকতে পারলাম না। আমার সব বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। আমি বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

লালপাহাড়ীর পথঘাট সব আমার চেনা। তিন বছর এখানে কাটিয়েছি, এখানকার দারোয়ান চাপরাশী সকলে আমাকে চেনে। বেরিয়ে এগিয়ে গেলাম। গেস্টহাউসের ফটকের মুখে গিয়ে দাঁড়ালাম। থমকে যেতে হল।

বারান্দায় কুমার দাঁড়িয়ে। আরও ক'জন লোক। যেন কি কথাবার্তা হচ্ছে।

দারোয়ান বললে—বাবু—ওই বোসবাবু ফিরে এসে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন।

পড়ে গিয়েছিলেন মাথা ঘুরে? আর বাধা রইল না। ছুটেই গেলাম। বললাম—কই? উনি কেমন আছেন? কুমারসাহেব!

কুমারসাহেব বললেন—এসেছিস? ভাল হইছে। আমি ভাবছিলাম তোকে ডাকি। আয়।

সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেন বিছানার পাশে। বললেন—থাক, সেবা কর। বাইরে লোক থাকল। ডাক্তারবাবু, বুঝায়ে দাও হে কি কখন করতে হবেক।

উনি আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন—মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল। হয় নি কিছু। মধ্যে মধ্যে মাথা ঘোরে। দেহটা দুর্বল হয়েছে। তোমার থাকবার দরকার হবে না।

কাঞ্চন বলেছিল—না।

কুমারও বলেছিলেন—না মশয়—উ থাকুক। না লয়।

বেয়ারাকে বললেন—আলোটো নিবায়ে নীল আলোটো জ্বেলে দে হে!

সকালবেলা দেখলাম—

শেষরাত্রে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

দেখলাম—ওঁর বুকের পাশে মাথা রেখে শুয়ে আছি। ওঁর হাত আমার গায়ের উপর। উনি আমার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছেন একদৃষ্টে।

লজ্জায় মরে গেলাম।

তুই আমার মেয়ে, তুই বুঝবি না, জানবি না। আমি আমার দেহব্যবসায় করা মায়ের মেয়ে; আমরা ছেলেবেলা থেকে দেখেছি—এতে লজ্জা নেই; মা বলত—এতেই ভাত এতেই কাপড়। লক্ষ্মী আমাদের এতেই। এতে লজ্জা নেই আমাদের। কিন্তু—

সেদিন কিন্তু সে যে কি লজ্জা হয়েছিল আমার! শুধু লজ্জা

নয়, আনন্দ! আনন্দ না হলে তো এ লজ্জা হয় না—আসে না। এ বড় মধুর! বড় মিষ্টি!

ফল ধরলে গাছ নুইয়ে পড়ে।

জীবনের গাছে জীবনফল না জন্মালে তো এমন লজ্জার ভার ঘাড়ে চেপে ঘাড় নুইয়ে দেয় না!

আমার লজ্জা দেখে তিনি আশ্চর্য হেসে আমার হাত চেপে ধরে বললেন—যেয়ো না!

মাথা হেঁট করে মাটির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘেমে উঠছিলাম,একটু অপেক্ষা করে বললাম—বলুন!

—বলুন নয়, বল—বল।

পারলাম না। বুকের ভিতর কেমন করে উঠল। কান্না যেন উথলে উঠল সমাদরে। কিন্তু কাঁদব কেমন করে তাঁর সামনে।

তিনি বললেন—সারাজীবন তো বিচ্ছেদের আঘাত পেলাম যাকে ভালবেসেছিলাম তার —। অকৃতজ্ঞতার আঘাত—আর তার কলঙ্কের লজ্জা মাথায় করে ভগবানকে ভালবাসতে গিয়েছিলাম। গান অনেক গেয়েছি—অনেক কেঁদেছি। কিন্তু সে নিজের দুঃখে নিজের লজ্জায়। তুমি আমাকে ভালবাসলে সব ছেড়ে, অনেক দুঃখ পেলে, ঠিক আমারই মত। কাল সারারাত ঘুমুই নি, চোখ বুজে পড়েই ছিলাম। তুমি একসময় ঘুমিয়ে পড়লে—মাথাটা খাটের বাজুর উপর লুটিয়েছিল। বড় মমতা হল—তোমাকে টেনে বুকের কাছে নিলাম, তুমি একবার চোখ মেললে—বললাম—খাটে উঠে একপাশে শোও। তুমি হয়তো বুঝলেও না কিন্তু তাই শুলে। তোমাকে বুকে চেপেও ধরেছিলাম। মানুষের দেহ—কাঞ্চন—এ দেহে কামনাই হল কালিন্দীর স্রোত—দিন রাত—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বইছে। এরই তটে ভগবানের বাঁশি বাজে কিনা জানি না—শুনি নি—তবে বাঁশি বাজে, সেই আত্মাপুরুষের বাঁশি বাজে। সে ডাকে। কাকে ডাকে

তা জানি নে—তবে এক একজনকে দেখে মনে হয় এর মধ্যেই তার বাস, একে পেলেই তাকে পাব। জীবনের সব চাওয়া পাওয়া হয়ে যাবে। কাল তোমাকে মনে হয়েছে তাই। জীবনে বাকী বেশী দিন নেই, যে কটা দিন আছে সে কটা দিন নিজেকে আমাকে দাও।

আর সহ্য করতে পারি নি। হা-হা করে কেঁদে ভেঙে পড়েছিলাম।

তুই আমার জীবনের সেই অমৃতফল মুক্তো।

তিনিই আদর করে নাম রেখেছিলেন—কাঞ্চনমালার জীবনের ফল মুক্তামালা।

তোর ভাগ্য তুই তাঁকে পেয়েও পাস নি। আট মাস বয়স হতে না-হতে তিনি চলে গেলেন।

মুক্তা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। মুখ তার যেন মাটির মূর্তির মত অথবা পাথরে গড়া। এই কয়েকদিন ধরে এ কাজ ও কাজ মায়ের সেবার মধ্যে এই কাহিনী সে শুনে এসেছে। প্রথম দিকটায় সে আঘাত পেয়েছে। যখন সে শুনেছে তার মায়ের প্রথম দিকের কথা তখনকার আঘাত তাকে প্রায় বিহ্বল করে দিয়েছিল। যখন সে প্রথম তার বাবার আসরে এসে গান গাওয়ার কথা শুনেছে—তাঁর জীবনের লাঞ্ছিত প্রেমের কথা শুনেছে, তাঁর অসাধারণ ধৈর্যের কথা শুনেছে তখন শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে তার মন ভরে উঠেছে। তার মায়ের শেষজীবনের কথাতেও তার মায়ের উপর শ্রদ্ধা হয়েছিল। কিন্তু তারপর ?

মা কাঞ্চন তার মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হল। তার অন্তর যেন কঠিন কিছুর স্পর্শে শিউরে উঠল। সে ডাকলে—মুক্তো !

মুক্তো মুখ ফেরালে তার দিকে।

মা বললে—বলবার আমার কিছু নেই আর। মরতেও খেদ নেই। এত কথা তোকে বললাম—তিনি তোকে সব কথা বলতে বলেছিলেন। বলেছিলেন—কাঞ্চন, মেয়েকে লেখাপড়া শেখাবার

ব্যবস্থা আমি করে গেলাম ; কিন্তু ও বড় হলে ওকে অন্ধকারে রেখো না। ওকে সব কথা বলো। তাই বললাম—আর—

সে চুপ করলে।

মুক্তো তবু কোন কথা বললে না।

কাঞ্চন বললে—আর বলা এই জন্যে মুক্তো—তোকে শক্ত করে তো দাঁড় করিয়ে যেতে পারলাম না, শুধু বলে গেলাম—তোর মা আমি—আমার যে কুলেই জন্ম হোক আমি মহৎ আশ্রয়ে থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি। সেই মহৎ মানুষ থেকেই তোর জন্ম। তোর বাপ যিনি—

মুক্তো বললে—তিনি আমার বাপ, কিন্তু তোমাকে বিয়ে করলেন না কেন বলতে পার ?

কাঞ্চনকে কে যেন চাবুক মারলে। সে আর্তস্বরে বলে উঠল—মুক্তো !

মুক্তো বললে—তিনি যদি তোমাকে বিয়ে করতেন—

—বিয়ে তিনি করতে চেয়েছিলেন—বৈষ্ণব হয়ে মালাচন্দন—

—মালাচন্দন ? ব্যঙ্গভরে কথাটা বলে উঠল মুক্তো।

—আর কি মতে হতে পারত বল ? তিনি কায়স্থ—

—কেন রেজেস্ট্রী করে—

—হত না। তাঁর প্রথম স্ত্রী ছেড়ে চলে গেলেও তিনি তাকে ছাড়েন নি—।

—তা হলে—।

—কি বল ?

—কিচ্ছু না মা ; চুপ করে একটু ঘুমোও। আজ ক' দিন ধরে তো বকেই যাচ্ছ। বারণ করলেও শোন নি। এবার তো কথা শেষ হয়েছে। এবার একটু বিশ্রাম কর।

—বিশ্রাম করব রে। একেবারে বিশ্রাম।

একটু চুপ করে থেকে কাঞ্চন বললে—আজ তো বেস্পতিবার, চাঁপাকে লিখলাম—সে এল না?

—না এলে কি করবে বল? কি হবে মিথ্যা ভেবে?

—ভাবনা তোর জন্যে। সেও তো আজ গেরস্ত হয়ে ঘর বেঁধেছে। একটা ছেলে, একটি মেয়ে—তারাও ইস্কুলে পড়ছে।

একটু হেসে মুক্তো বললে—আমার জন্যে ভেবো না তুমি। আমি মিশনে চলে যাব। কৃশ্চান হয়ে যাব।

—মুক্তো! চীৎকার করে উঠল কাঞ্চন।

মুক্তো বলে উঠল—তোমার ওই ধর্মকে আমি ঘেন্না করি। ভগবানের নাম করে তোমরা অন্যায় করেছ। আমার পরিচয় কি বলতে পার মা? কাঞ্চন কীর্তনওয়ালীর মেয়ে—এক বোসবাবু উকীলের এক—; বল মা বল, তুমি তার কে—কি?

কাঞ্চন রুদ্ধ রোষে উঠে বসল ধড়মড় করে, মুখ চোখ তার লাল হয়ে উঠেছে—সে বললে—আমি তাঁর দাসী। দাসী। তিনি প্রভু। আমি ভালবেসে তাঁর চরণে বিকিয়েছিলাম—আমি তাঁর দাসী—

মুক্তো বললে—আমি সে পরিচয় আমার পরিচয় থেকে মুছে দেব। আমি দাসীর মেয়ে নই। নিজে কারুর দাসী হব না। তোমার প্রভুর মেয়ের পরিচয়েও আমার কাজ নেই। আমি মানুষ। আমি মেয়ে। বলেই সে ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কাঞ্চন একদৃষ্টে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। থাকতে থাকতে বোধ করি আর পারলে না। ঘাড়টি লুটিয়ে দিলে বালিশের উপর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কাঞ্চনমালা সেই যে ঘাড় লুটিয়ে:পড়ল—সে-ঘাড় সে আর তুলতে পারলে না।

দেহ জীর্ণ হয়েছিল মৃত্যুর পদধ্বনি সে কানে শুনছিল—তাতে হতাশা তার খুব একটা ছিল না। রোগে দীর্ঘদিন ভুগলে মানুষ অনেকটা প্রস্তুত হয়ে যায়; তার উপর এই মানসিক আঘাতটা তার বড় লাগল। জীবনের সব কথা মেয়েকে খুলে বলবার পর এই ধরণের নিষ্ঠুর ঘৃণাত্মক আক্রমণ সে মেয়ের কাছে প্রত্যাশা করে নি। মেয়ে সে কামনা করে নি। কামনা সে তাঁকে করেছিল। তাঁকে পেয়েছিল—তার ফল সে। দেহব্যবসায়িণী কাঞ্চনের কোলে যদি তুই আসতিস মুক্তো তবে তোকে আজ—। না—সে কথা আর কাঞ্চন মুখে আনবে না। তবে মুক্তো যেন তার মুখে থুথু ছুড়ে থুৎকার দিল। আর তার মরা বাপের উদ্দেশে আকাশে ছুড়ল—তা এসে তারই মুখে পড়ল। জন্মের দায় যে কত বড় দায় তার কতটুকু তুই বুঝিস?

তোর জন্ম কথা তুই জানিস নে, কাঞ্চন জানে।

রোগ শোক দুঃখ যন্ত্রণা লজ্জা ভয় সব কোথায় মিলিয়ে যায়। মাটি আকাশ চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র সব মুছে যায়। কেউ থাকে না, কিছু থাকে না—ধর্ম অধর্ম পাপ পুণ্য কিছু থাকে না। সন্তান আসে—আসে তোরই মত। কিন্তু তারও কোন বাসনা থাকে না। থাকে শুধু দু জন। দু জন মিশে একজন হয়ে যায়।

তিনি বলতেন—। থাক তাঁর কথা, তুই তাঁকে ঘেন্না করলি—আপমান করলি, আমাকেও করলি। যাক।

তার চীৎকার ক'রে বলতে ইচ্ছে হল মেয়েকে ডেকে—। না ; সে কথা কুৎসিৎ। বাল্যকালে সে তাদের পাড়ায় শুনেছিল—যুবতী মেয়েকে বলেছিল বুড়ী মা !

ওই বুড়ী মা বৈশাখ মাসে কি যেন ব্রত করেছিল। যুবতী মেয়ে প্রমত্ত অবস্থায় মাকে তার যৌবনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিল সেইগুলো মনে পড়ে না ? তোর পড়ছে না—কিন্তু ধর্ম তোর ভোলে নি—সে যে লজ্জায় মরে গেল। ধর্ম ? ধর্ম আবার কিসের লা বুড়ী কসবী ? মুহূর্তে মায়ের পুরনো দিনের ভাষা বেরিয়ে এল। শেষ বলেছিল—একদিন তোরও এমনি হবে দেখবি। ধর্ম আজ তোর কাছে লজ্জায় মরছে। বয়স যখন পড়বে—তখন দেখবি সে মুখ খুলে এসে বলবে— নে আমার পায়ে ধর।

থিয়েটারে চাকরীর সময় সে দেখেছে। গল্প শুনেছে। এ পাপ মানুষ জন্মের দায়েও করে—তাদের সমাজে করে, আবার অন্য সমাজের—যাদের এ জন্মের দায় নেই তারাও করে—কর্মের দায় তাদের। পাপ থেকে আবার মুক্তির টানও সবারই আছে। তুই যা বললি মুক্তো, বললি, গোবিন্দ তোকে মার্জনা করুন।

বিনোদিনী এ্যাক্ট্রেস—তোরা এখন বলবি অভিনেত্রী—তার কথা জানিস ? এত বড় এ্যাক্ট্রেস যে আজও লোকে নাম করে। বিনোদিনী তাদের জাতের। এ্যাক্ট্রেস হয়ে গিরীশ ঘোষের স্নেহ পেয়েছিলেন। গিরীশ ঘোষ পরমহংস দেবের কৃপা পেয়েছিলেন। ভেলায় চড়ে মহা সমুদ্র পার। জন্ম কর্ম সব জড়িয়ে পাপের সমুদ্র অনায়াসে পার হয়ে গিয়েছিলেন বিনোদিনী।

তারাসুন্দরীকে সে নিজে দেখেছে। তাঁর ছেলেদের দেখেছে। বড় ছেলে থিয়েটারে কাজ করত। আজও হয় তো করে কিম্বা অন্য কিছু করে। ছোট ছেলে খোকাকে দেখেছে। তার সমাদর দেখেছে, ছেলেটির তরিবৎ দেখেছে, তার মর্যাদা বোধ দেখেছে।

খোকার মৃত্যুর পর তারাসুন্দরী ভুবনেশ্বরে গিয়ে বাকী জীবনটা কাটিয়েছেন।

কই তারা কি এমন অপমান করেছে তাদের মায়েদের?

পাছে তার জীবনের পাপ তাকে স্পর্শ করে তাই সে তাকে সন্তর্পনে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। তার বাপ—সেই অপরূপ মানুষ—তাকে সে আজ অপমান করলে?

মিশনারী ইস্কুলে তাকে পড়তে দেওয়া তার ভুল হয়েছিল। ভুল তার নয়—ভুল তাঁর।

সে জানে সংসারে কেউ কারুর ভার নেয় না। সবার ভার যাঁর উপর—ভার তাঁর। কিন্তু তবু—তবু মন মানে না। চাঁপা—তার সহোদরা। শুধু তাই নয়, চাঁপাও আজ দেহব্যবসায়িনী নয়, সে গৃহস্থ সে সংসারী। তাকে সে আসতে লিখেছে। কিন্তু এই মুক্তো কি সেখানে মানিয়ে চলতে পারবে? পাপ জন্মে নয় কর্মে; পাপ কারুর জীবনে অক্ষয় বট নয়, পাপ জীবনের আগাছা। নিড়েন দিয়ে ফসলের ক্ষেতের মত পরিষ্কার করলেই পুণ্যের ফসল ফলবে।

চাঁপার জীবনেও তাই ফলেছে। তার আজ স্বামী হয়েছে—ছেলে-মেয়ে হয়েছে সংসার হয়েছে। সেও ওই ভালবাসার জন্যে হয়েছে।

সুরেন দা চাঁপার স্বামী—থিয়েটারে ড্যান্সিং মাষ্টার। সুরো মাষ্টার। সুরো মিত্তির নেপা বোসের ছাত্র। সুরো মাষ্টার মিত্তির কায়স্থবাড়ীর ছেলে। বখা ছেলে। আলিবাবার আবদালার পার্টে নেপা বোসের পরেই ছিল সুরো মাষ্টারের নাম! যে দিন কুমার সাহেব তাকে থিয়েটারে মর্জিনার পার্টে দেখে তার উপর ঝুঁকেছিল, সে দিন সুরো মাষ্টারই ছিল আবদালা। সেই সুরেন এখন চাঁপার স্বামী। মানুষ পাপী নয় রে মুক্তো; পাপ তার সয় না। যৌবনের নেশার ঝোঁকে করে—ওসময় জীবন থাকে জোরালো—জীবনের ঘরে যে পরমাত্মাই বল আর আসল মানুষই বল তাকে সে কায়দা করে

রাখেরে! তখন ছোটে সে পাগ্‌লা ঘোড়ার মত। মানুষের মত মানুষও তাকে বাগ মানাতে পারে না কোন রকমে, ঘোড়ার গলা আঁকড়ে ধরে বসে থাকে।

ওঃ কি মানুষই ছিল সুরেন মিত্তির। সুরো মাষ্টার। কি মানুষ কি হল! মেয়েরা বলত—ঠগ সুরেন।

ঠকাত মেয়েদের। না, ঠকাতো না। নাচের দলের মেয়েদের ঘরে পালা করে রাত্রিবাস ছিল তার বাঁধা নিয়ম। যেদিন যার পালা সেখানে ঠিক গিয়ে উঠত এগারটার পর। ওটা তার ঠকানো ব্যবসা ছিলনা—ওটা ছিল তার দক্ষিণে। সে বলত—এই! আজ দক্ষিণে আদায়ে যাব।

তবে সে খাবার কিনে নিয়ে যেত। খাবারের প্রথম দফায় নূন নয় শাক নয়—মদ।

সে সব মনে করতেও তার মন কেমন ছি ছি করে। গোবিন্দ স্মরণ করে সে মনে-মনে। হয় তো সুরেনও আজ করে। বলে ওঠে হরি-হরি-হরি। কিম্বা তারা তারিণী।

কলকাতার কাছেই সুরো মিত্তিরের বাড়ী। চেহারা ভাল ছিল—গানের গলা ছিল—তালে হুঁস ছিল। ইস্কুলে ক্লাস নাইন পর্যন্ত উঠেই পেয়েছিল থিয়েটার বাতিকে। ফিমেল পার্টের জন্য মেয়েলি চেহারা, গলা যা দরকার তার ছিল—সুতরাং ইস্কুল থেকে খসে পড়ে এ্যামেচার ক্লাবে ভিড়ে গেল। এ্যামেচার থিয়েটার থেকে যা রোজগারটা হ'ত তাতে তখনকার পাঁচসিকেতে পাঞ্জাবী—ন-সিকে আড়াই টাকায় পেটা ধুতি—তিন চার টাকায় লপেটা—দু আনা বাক্স কাঁইচি সিগারেটের দিনে চলে যেত তার। ভাতটা ঘরে থাকতে বাড়ীতে—সুরেন বলতো ফাদার'স হোটেলে মিলত। বাপ মারা যেতে ভাইরা ঝেড়ে ফেলে দিলে। বিয়েটা বাপ দেয় নি, সেও করে নি, কারণ তখনই সে ভ্রমরা

হয়ে উঠেছে। এরপর মথুর শার যাত্রার দলে। প্রথম হিরোয়িন, তারপর ড্যান্সিং মাষ্টার। ওই যাত্রার দলে থাকতেই নেপা বোসের সঙ্গে আলাপ। কলকাতার বড়লোক বাড়ীতে যাত্রা হচ্ছিল। সেই আসরে নেপা বোস ওর নাচ দেখে ওকে ডেকে বলেছিলেন— পা তো তোমার মন্দ নয়, চেহারাখানাও আছে—গলাটা একটু মেয়েলি—সেটা অভ্যাস করে করেছ। তা—কি পাও? থিয়েটারে এস না। পার্টও করতে পার!

সে ঝট ক'রে ঝুঁকে পড়ে পায়ের ধুলো নিয়েছিল।

নেপা বোস পিছিয়ে গিয়ে বলেছিলেন—মারব থাপ্পড়। বলা নেই কওয়া নেই পায়ে হাত! জাত কি? বামুন নয় তো রে বাবা।

—আজ্ঞে না কায়স্থ।

—বহুৎ আচ্ছা। নে বাবা এবার তুবার নে—ঝেড়ে মুছে চেঁচে ছুলে নে। কিন্তু চামড়ার জুতোর ঘামে তুর্গন্ধ বড্ড।

সে হেসেছিল।

তিনি বলেছিলেন—কাল যাস। তারপরই জিজ্ঞেস করেছিলেন—বিয়ে করেছিস?

—আজ্ঞে না।

—জিতা রহো বেটা। ঠিক লাইনে এসেছিস--। বিয়ে করিস নে।

থিয়েটারে ঢুকে সে সহজেই পথ করে নিয়েছিল। ঝোলে ঝালে অম্বলে সবেই সে কাজে লাগত এবং কাজে লাগবার নেশা ছিল তার। তবলা বাঁয়ায় ভাল হাত ছিল, এ্যামেচারে যাত্রায় সে মেক-আপম্যানের বিদ্যে শিখেছিল—তাতেও হাত লাগাত। বড়বাবুর হুকুম শুনত, পাশেপাশে ঘুরত, ম্যানেজারকে সব খবরাখবর জোগাত, যিনি সব থেকে বড় এ্যাক্টর—তার পরিচর্যা করত।

আস্তানা একটা ছিল, সেটা কালিঘাটে। হাজরা পার্কের পাশে ছিল মেথর পাড়া—তার গা ঘেঁসে ছিল একটা বেশ্যাপল্লী—তারই কাছাকাছি একটা আড্ডা তার ছিল। সেখান থেকে উঠে এসে আড্ডা নিয়েছিল—গ্রে ষ্ট্রীটের কাছাকাছি শ্যামবাজারের বাজারের উপর তলায় দক্ষিণ দিকের একটা ঘরে। সেও শুধু নামে। সকাল বেলাতেই সে পাশবোতাম পাঞ্জাবী চড়িয়ে এসে বসত থিয়েটারের টিকিট ঘরের পাশে। পাশেই চায়ের দোকান—পান সিগারেটের দোকান। বেগুনী ফুলুরী তেলেভাজারও একটা ফুটপাথি দোকান ছিল। তেলেভাজার সঙ্গে চা, তারপর কখনও বিড়ি কখনও সিগারেট। কোন কোন দিন মালিক বড় কর্তার কেস থেকে সরানো দামী চুরোট ধরিয়ে ব'সে থাকত, তারই মত আর দু চারজন যারা আসত তাদের সঙ্গে গল্প করত। গল্প অন্য কিছু নয়—অন্য থিয়েটারে চলতি বইগুলির সমালোচনার নামে শ্রাদ্ধ। এরই মধ্যে উপযাচক হয়ে থিয়েটারের ভিতরে যারা ষ্টেজের কাজ করে তাদের সাহায্য করত। নতুন বইয়ের সময় প্রথম দশ পনের দিন সকালবেলায় গানের মেয়েরা আসত, রিহারস্যাল দিত; সুরো ড্যান্সিং মাষ্টার—গানও সে জানত সুতরাং রিহারস্যাল দেওয়াতো সেই।

বেলা এগারোটা বারোটায় বাসায় ফিরত, ষ্টোভে রান্না করত; রান্নার মধ্যে ভাতটা ফুটিয়ে নিত, আর একটা ভাজা কি তরকারী; তার সঙ্গে রেষ্টুরেন্ট থেকে খানিকটা মাংস আনিয়ে নিত। তারপর নিদ্রা। আবার বিকেলে উঠে থিয়েটার। সেই বেশবাস! তবে, ওবেলাই হোক আর এবেলাই হোক প্রত্যেক বেলাতেই মনে হ'ত পাটভাঙ্গা জামা কাপড়। তার আর্থিক স্বাচ্ছল্য তার হেতু নয়, ওটি তার নিজের কৃতিত্ব। সে নিজেই কাপড় কুঁচিয়ে নিত—চমৎকার হাত ছিল ওই কোঁচানো বিদ্যাটিতে। ওই কাপড় কোঁচানো বিদ্যের জন্যই সে মালিকের প্রসাদ পেয়েছিল। মালিকের চাকরের কোঁচানো

বিদ্যের হাতের চেয়েও তার হাত সরেস ছিল। মাসের প্রথমেই খান কয়েক কাপড় তার কাছে আসত—সে সেগুলি কুঁচিয়ে ব্যাগে পুরে থিয়েটারে কর্তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে প্রণাম ক'রে চলে যেত। এ ছাড়াও তার আর একটা কৌশল ভালভাবে জানা ছিল। সেটি বাটি ইস্ত্রি বিদ্যে। তখন ইলেট্রিক ইস্ত্রি ছিল না, লোহার ইস্ত্রি, তারও উনোন টুনোন নিয়ে অনেক হাঙ্গামা। বাটি ইস্ত্রি মানে ভারী একটা কাঁসার বাটি গরম ক'রে তাই দিয়ে ইস্ত্রি ক'রে নেওয়া। ব্যাপারটায় সরঞ্জামের হাঙ্গামা কম কিন্তু ইস্ত্রিকারীর কৌশল বেশী। প্রতিবার জামাটি খুলে সঙ্গে সঙ্গে পাট এবং ইস্ত্রি করে রাখত সুরেন। কাপড় ছেড়ে পরত লুঙ্গি অথবা গামছা। এবং ছাড়া কোঁচানো কাপড়খানিকে নিয়ে আবার তার কোঁচগুলির সংস্কার করে সদ্য কোঁচানো কাপড়ের মত গুটিয়ে বেঁধে রাখত।

এই সুরো মিত্তির—বাইরে সুরো মাষ্টার—নাচের মেয়েদের মহলে গোপনে সুরো নচ্ছার—প্রকাশ্যে সুরোদা। এই সুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অবাক ক'রে ভালবেসে বিয়ে করেছে চাঁপাকে।

সুরোর এই বিয়ে নিয়ে থিয়েটার মহলে কম হাসি ঠাট্টা হয় নি। কিন্তু সুরো বলত—পরশমণি জান মাণিক? ভালবাসা পরশমণি, ওঁর ছোঁয়া লাগলে লোহা সোনা হয়।

* * *

অন্যে সে কথা বিশ্বাস করুক না করুক কাঞ্চন বিশ্বাস করে। তার জীবন সোনা হয়েছে। সে সোনায় সে জীবনকে গড়েছে রাধা-শ্যামের মন্দির করে; সুরো মিত্তির আর চাঁপা—তারা মন্দির গড়ে নি—এই সোনার মূলধনে গড়েছে ঘর সংসার। তারা এখন গেরস্তের মত বাস করছে।

কাঞ্চন চলে এল লালপাহাড়ী থেকে ; কুমার কাকার বাগানে এল রূপসী হামিদন বেগম। সেখানে নতুনের ছটায় মহফিলের জলুষ ঝলমলিয়ে উঠল। নাচ গান খানা পিনা সে প্রায় বারো মাসে তের পার্বণের ব্যাপার। রাজা সাহেব একটু চঞ্চল হলেন। এ পথের পথিকদের নেশা রূপেরও নয়, দেহেরও নয়, গুণেরও নয়। এ নেশা নিত্য নতুনের নেশা। রাজা সাহেব হিসেবী লোক বলেই তাঁর নতুনের নেশাটা একটু দ'মে থাকে। সংসারে যে মাতাল দাম হিসেব ক'রে মদ খায় তারা কেনা বোতলটা না শেষ হওয়া পর্যন্ত নতুন কেনে না। হোক না কেন নতুন বোতলের গড়ন সুন্দর এবং মদের রঙ ও গন্ধ নতুন রকম। অনেক ধন এবং অনেক জনের মাথায় যারা দণ্ডমুণ্ডের মালিক হয়ে বসে, তাদের মধ্যে এই ধরণের হিসেবী লোক কম। সেই কম লোকেদের একজন এই রাজা সাহেব। কিন্তু মন তো চঞ্চল হয়। ভিজে ঘাসে আগুনের ফুল্কি এসে পড়ার মত পড়ে, খানিকটা ঘাস হয় ঝলসে দেয় তারপর নিভে যায়। কিন্তু বাতাস যদি অনুকূল হয় আর আকাশে যদি প্রখর রৌদ্র থাকে তবে ভিজে ঘাসকেও শুকিয়ে নিয়ে আগুন জ্বলে।

রাজা সাহেবের আশে পাশে পারিষদের দল ছিল সেই অনুকূল বাতাস আর জীবনের আকাশে খট্‌খটে চড়া রোদের মত। অনেক টাকার সমাগম হয়েছিল তাঁর জমিদারীর আকাশ থেকেই। বড় সাহেব কোম্পানী কয়লা তুলে আকাশ পথে তার খাটিয়ে, তারে গেঁথে টব নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছিল। তারা রাজার এলাকায় তার নিয়ে যাবার জন্য সেলামী দিয়েছিল মোটাটাকা।

মো-সাহেবরা রাজা সাহেবকে জপাচ্ছিল—"দেশে আর মান থাকছেক নাই, নানান জনে নানান কথা বলছেক। কুমার সাহেবের পিঁজরাতে এল নতুন পাখী, রাজা সাহেবের পিঁজরা সোনার হলে হবেক কি ?—পাখীটা সেই বুড়ীধাড়ী।

রাজা সাহেব বলেছিলেন বলুক হে, উহারা জানে নাই, পুরানো চাল ভাতে বাড়েক, সহজে হজমি হয়।

পরের দিন সব থেকে পেয়ারের মো-সাহেব—সে এল। তার পরণের কাপড়খানা জামাটা ময়লা এবং ঘামের বিশ্রী গন্ধে প্রায় অসহ্য। রাজা সাহেব বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন—এই—শালার-বেটা শালা!

সে বলেছিল—আজ্ঞা রাজা সাহেব!

—ই কি ক'রে এসেছিস তু? অঁ? ই কি কাপড় চোপড়?

—আজ্ঞা হুজুর—ই কাপড়খানা আজ্ঞা খুব দামী, খাস ঢাকাই, আর জামার ছিল্কটা দেখেন খাস মুরশিদাবাদি। হুজুর কিনে দিয়েছেন সিবারে, আমার পরে খুসী হয়েছিলেন—সেই থিয়েটারে যিবার কাঞ্চন আর চাঁপাকে পছন্দ ক'রে আনা হল! সেই আপনি শুধালেন কোন মেয়াটা সব থেকে ভাল—তা আমি বললম ওই ওইটি—চাঁপা বল্যা মেয়েটি। আপনকার মনের সঙ্গে মিলে গেল। পরের দিনে সব গেলাম উদের বাড়ী, আপনি কিনে দিলেন এই জামা কাপড়।

রাজা বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন—হুঁ হুঁ মনে রইছে হে, বেবাক মনে রইছে। তা সে বহুদিনকার কথা। পুরানো হইছে।

সে বলেছিল—আজ্ঞা হুজুর, পুরানোর কদর আপনি কইলেন কাল, পুরানো চাল ভাতে বাড়ে, সহজে হজমি হয়।

রাজা সাহেব বলেছিলেন—হঁরে, শালা এখুনও বলছি। তা কাপড় জামা কাচাকুচি কর নাই ক্যানে হে? কি বদ গন্ধ উঠছে—শালার নাকের ফুটা দুটো বুজে গেইছে নাকি হে?

—আজ্ঞা না। নাক ঠিক আছে। তা পুরানো জিনিষে গন্ধ হয়। কাচতে গেলে যি ছিঁড়ে যাবেক। পাটে পাটে এলায়ে যাবেক। চাঁপা যি চাঁপা তাকে কাচাকুচা কর‍্যা দেখেন কি হয়? তার বদবাস আপনিও পান না, আমিও পাই না এই জামা কাপড়ের।

—ওরে শালা! শূয়ারের বাচ্চা! বলে হো—হো ক'রে হেসে উঠেছিলেন। বড়া বুলেছিস রে শালার বেটা, খুব বুলেছিস!

এরপর কাঁচা ঘাস শুকিয়ে এই বাতাসে জ্বলল মনের আগুন। ঠিক কথা। এবং যে কথা সেই কাজ একবারে সঙ্গে সঙ্গে। আগুন জ্বললে তো আর ঢাকা পড়েনা! চাঁপা বাতিল হল। কিন্তু তাঁর কাজের ধারা আর কুমার সাহেবের কাজের ধারা একরকম নয়। কুমারের মেয়েমানুষ পোষার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাতে শুধু হৈ চৈ দেওয়া থোওয়ার মধ্যেই শুধু একটা আতিশয্য নেই, তাকে ছাড়বার সময় একটা ঝগড়া ক'রে তাকে চাবুক মেরে একটা কাণ্ড না করে সোজা কথায় তাকে তুই চলে যা এই নে তোর পাওনা বলে কারবার শেষ করতে পারেন না। কিন্তু রাজা সাহেবের ধারা ধরণ সোজাসুজি। কোন কারণে চটলে বিচিত্র সাজা দেন। চুল কামিয়ে ন্যাড়া ক'রে ভাগিয়ে দেন, টাকাকড়ি দেন না। কিন্তু জবরদস্তি টাকা প্রাপ্তির রসিদ লিখিয়ে নেন। গভীরতর অপরাধে কঠিনতর শাস্তি হয়—মেয়েটা অক্ষত দেহে যায় অনেক সাক্ষীর সম্মুখে কিন্তু তারপর আর কোথাও গিয়ে পৌঁছয় না। কিন্তু এই এমনই ধারার জবাবের সময় সোজা ডেকে বলেন—ইবার ফারকৎ। এবং তাকে খুসী ক'রে বিদায় করেন।

চাঁপাকে তিনি সোজাসুজি ডেকে বলেছিলেন— চাঁপা! তুর ইবার ছুটি! একটু হেসে বলেছিলেন—ই শালারা আর দেশের শালারা বদনামি করছেক। বলছেক কুমার সাহেবের এমন খুবসুরত নতুন বিবি এল আর রাজা সাহেবের সেই পুরনো বিবি—দশবছুরে বালাপোষের মতুন! তা—। তা' তুকে ছুটি দিচ্ছি। এখন বল কি লিবি তু? তু আমাকে খুসী করেছিস। হুঁ—তা করেছিস! বল।

চাঁপার কাছেও কথাটা চাপা ছিল না—সে শুনতে পাচ্ছিল—সে মনে মনে তৈরী ছিল; এদিকে কাঞ্চনের সঙ্গে মায়ের যা হয়ে গেছে তা

থেকে সে সাবধান হয়ে নিজের অর্জন নিজে সঞ্চয় করে শক্ত ভিতের উপরই দাঁড়িয়েছিল এবং হিসেবীও ছিল। সে আপত্তি না করে রাজাসাহেবের কথায় হাসি মুখেই বলেছিল—বেশ। রাজাসাহেব যা হুকুম করবেন তাই। আমি না বলবার কে? আর সাজবেই বা কেন? তবে কাঞ্চনের মত একটা মাসহারা করে দেন। একটা বাড়িটাড়ি করে দেন। নইলে লোকে কি বলবে?

রাজাসাহেব বাড়ি একটা কিনে দিয়েছিলেন; ভবানীপুর কালিঘাটের দক্ষিণে টালিগঞ্জ পর্যন্ত তখন কলকাতার সীমানা এগিয়ে গেছে; বজবজ রেললাইনের দক্ষিণে রসা রোডের দুই পাশে কলোনী হচ্ছে। অনেক ব্যবসাদার সস্তায় জায়গা মালমসলা কিনে বাড়ি তৈরি করে বিক্রি করছে। চাঁপাকে সেইখানে একখানা বাড়ি তিনি কিনে দিয়েছিলেন। পল্লী ভদ্রলোকের। তবে মাসোহারা সম্পর্কে বলেছিলেন—উটি হবেক নাই। উ কাকা সাহেব করে—উহার সাজে। আমি রাজা আমার সাজে না। আর উ আমি ভালবাসিনা হে। চাঁপা আপত্তি করে নি। বাড়িই যথেষ্ট। বাড়ি ভাড়া দেবে—নিজে নিজের সমাজের অঞ্চলে বাড়ি ভাড়া করে থাকবে এবং থিয়েটারে কাজকর্ম নেবে। এই ঠিক করেই কলকাতায় এসেছিল। মায়ের কাছে সে যায় নি। তার মায়ের তখন চরম দুর্দশা। এক অল্পবয়সী হিন্দুস্তানী পানওয়ালা তার কাছে বাড়িঘর সব দলিল করে লিখিয়ে নিয়েছে—কোকেনে মরফিয়ায় অভ্যস্ত করেছে, নানান রোগে ধরেছে। দিদির অবস্থা মায়ের অবস্থা দেখে সে হিসেব করেই বোধ হয় মধ্যপন্থা নিয়েছিল। দিদি ভালবেসে হল সন্ন্যাসিনী, সন্ন্যাসিনী না হোক একরকম বৈরাগিনী বষ্টুমী। কেত্তন ছাড়া গান করে না। নিরিমিষ্যি খায়—। বিধবার মত বেশভূষা। ভাগ্যে মেয়েটা কোলে এসেছিল তাই, না হলে হয়তো বৃন্দাবনে গিয়ে ভিক্ষে মেগে খেত। আর ওদিকে মা হয়েছে—নেশাখোর, কোকেন—কোকেন থেকে এখন

মরফিয়া ধরেছে। ওই একটা পাষণ্ডকে ধরেছিল এখন তাকে ছেড়ে, বলতে লজ্জা, ধরেছে হিন্দুস্থানী পানওয়ালা গুণ্ডাকে। ওই তুই পথ এড়িয়ে সে পথ বেছে নিয়েছিল! ওই; চাকরী করবে থিয়েটারে, রাজার দেওয়া বাড়িটা খাটাবে ভাড়ায়। দেহ নিয়ে ব্যবসায় রুচি খুব ছিল না। রাজার আশ্রয়ে থেকে এইটুকু অন্তত হয়েছে, বহুজনায় একটা অরুচি। রাজার কাছে বাঁদীর মত থেকেও একজনকে ভজে থাকার একটা স্বাদ পেয়েছে। থিয়েটারে চাকরিও মিলেছিল, তার বয়স তখন যায় নি। চব্বিশ পঁচিশের বেশী নয়। তখন থিয়েটারে শিশিরবাবুর যুগ পড়েছে—তবুও মধ্যে মধ্যে পুরনো আমল ফিরে আসে। পুরনো আমলের লোকেরা মিনার্ভা থিয়েটারে ভিড় করেছে। আত্মদর্শন নাটক খুব জমেছে। চাঁপা একদিন সন্ধ্যেবেলা একখানা রিক্‌শায় করে সেখানে গেল; মালিকের পায়ে হাত দিয়ে প্রমাণ করে সোজাসুজি বললে—বাবা, ফিরে এসেছি, একটা চাকরি দিয়ে রাখুন। যা দেবেন। সখীর দলে নাচতে বললে তাই নাচব।

মালিক হেসে বললেন—ফিরে এলে!

—হ্যাঁ বাবা।

—আর পারবে? রাজারাজড়ার বাগানে এতদিন রানীগিরি করে—

—রানীগিরি নয় বাবা বাঁদীগিরি।

—হ্যাঁ—তা বটে! তা দেহ তোমার মজবুদ আছে; সখীর দলে ভালই মানাবে। পা-টাগুলো ঠিক আছে তো? অভ্যেস আছে?

—দেখুন। সে সব ঠিক আছে। এখনও একটানা আধঘণ্টা তো সমানে নাচব।

—আচ্ছা, দেখি! ওরে দেখ তো সুরো কোথায়?

সুরো মাস্টার কাছেই ছিল। সে শুনেছিল কোথা থেকে একটি নতুন মেয়ে এসেছে। শুনে অবধি দেখবার জন্যে সে ছুঁক ছুঁক

করেই ফিরছিল। মালিক ডাকবামাত্র—আমাকে ডাকছেন—বলে ঘরে ঢুকে আর স্যারটা বলতে অবকাশই পায় নি।

চাঁপাকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল—চাঁপা!

হ্যাঁ। চাঁপাই। চাঁপা যখন এখান থেকে লালপাহাড়ী যায় তখন তার আপশোষের সীমা ছিল না। সবে তখন সে যৌবনে পদার্পণ করেছে। তখনও দেহ তার পরিপুষ্ট লাবণ্যে যৌবনমাধুর্যের পরিপূর্ণতায় ফুটে উঠতে পারে নি। কাঞ্চনের খ্যাতি তখন বেশী, সে সখী দলের এলাকা পার হয়ে অ্যাক্‌ট্রেস হচ্ছে, চাঁপা সখীর দলে নাচত কিন্তু কি ছিল তার লাস্য, কি উজ্জ্বলতা! কি নাচের পা! চাঁপার সঙ্গে বয়সের পার্থক্য তার বিশ বছরের কম নয় কিন্তু তখন থেকেই তার রূপে লাস্যে উজ্জ্বলতায় মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল। সেই চাঁপা! লালপাহাড়ীর বনদেশে থেকে চাঁপার রঙে কালচে আমেজ ধরেছে কিন্তু দেহ যৌবনে কি ভরাই ভরে উঠেছে যে!

চাঁপাই বলেছিল—চিনতে পারছেন না আমাকে—মাস্টারদা?

—তা পারছি। কিন্তু—কি ব্যাপার? তুমি তো লালপাহাড়ীতে থাক।

—না, আর থাকি না। চলে এসেছি।

—চলে এসেছ?

—হ্যাঁ। এখন চাকরির জন্যে এসেছি—বাবার কাছে। বাবা বলেছেন আপনার হাত।

কর্তা বলেছিলেন—হ্যাঁ। চাকরী চাচ্ছে। পুরনো মেয়ে, এতদিন থাকলে এ্যাকট্রেস হয়ে যেত। তা আর কি করবে? নিয়ে :নাও। এখন নাচের দলে কাজ করুক।

সুরো বলেছিল—তা বেশ। আমাদের বাঁয়ের মুখপাতটা একটু নরমও বটে। তা ভালই হবে।

চাকরি হয়ে গিয়েছিল। চাকরি নিয়ে ফেরবার পথে রিক্‌শায় উঠে একটু পথ এসেছে একটা গলির মোড়ে, পিছন থেকে সুরোদা এসে রিক্‌শা থামিয়ে তার পাশে বসে বলেছিল—চল!

চাঁপা প্রথমটা খুশী হয় নি। সে বলেছিল—আপনি কোথায় যাবেন?

—তোমার বাড়ি। আপত্তি আছে?

আপত্তি থাকলেও করা যায় না এ ক্ষেত্রে; বিশেষ করে সে আমলে যেত না। থিয়েটারের ড্যান্সিং ব্যাচে কাজ করে ড্যান্সিং মাস্টারকে প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব ছিল। চাঁপা চুপ করেই গিয়েছিল অগত্যা। সুরো মাস্টার বলেছিল—গল্প শুনব। একটু মদ খাব। তুমি খাওয়াবে। চাকরি পেলে। কি বল?

—বলব আর কি? চলুন।

—রাগ করছ না তো?

—তা করলেই বা কি হবে? মনের রাগ মনেই রাখতে হবে।

—এই রিক্‌শা রোখ্, রোখ্ রে বাবা। রোখ্!

চমকে গিয়ে রিক্‌শাওয়ালা দাঁড়িয়েছিল। লাফ দিয়ে নেমে সুরো মাস্টার বলেছিল—আচ্ছা চললাম। কিছু মনে কর না।

মাস তিনেক পর, নতুন একখানা বই পড়ল রিহারশ্যালে। তাতে ছিল সাঁওতালি নাচ। থিয়েটারে সে আমলে এক ধরনের বিকৃত হিন্দী চলত সাঁওতালি কথা হিসেবে, আর নাচও ছিল সেই রকম একটা বিকৃত ব্যাপার। চার বছর লালপাহাড়ীতে থেকে চাঁপা সাঁওতালি কথা নাচ সবটাই ভাল করে শিখেছিল। সে শঙ্কা এবং সংকোচের সঙ্গে সুরো মাস্টারকে বলেছিল—একটা কথা বলব সুরোদা?

—বল।

—রাগ করবেন না তো?

হেসে সুরোদা বলেছিল—করলেই বা কি বল। মনের রাগ মনেই চাপতে হবে।

এবার চাঁপাও না-হেসে পারেনি, হেসে বলেছিল—বাবা বাবা!

—সুরোদা কথা ভোলে না।

—না ভুলি না। তবে কি জান—তোমার উপর রাগই করতে পারি না।

—কেন?

—সে জানি না। তোমাকে দেখলে আমার মনটাই কেমন হয়ে যায়। রাগ থাকে না। বুঝেছ! কিন্তু কি বলছ?

—বলব। এখানে নয়; আজ রিহারশ্যালের পর আমার ওখানে যাবেন। নেমন্তন্ন করছি।

—জয় জয় কালী কলকাত্তাওয়ালী।

ওই প্রথম রাত্রেই তারা বাঁধা পড়ল দুজনে দুজনের কাছে। প্রথম চাঁপা তাকে দেখালে আসল সাঁওতালি নাচ; শুধু নাচ নয়—লালপাহাড়ীতে সংগ্রহ করা সাঁওতালি শাড়ী; দেখালে সাঁওতালি চুল বাঁধার ঢঙ। সেখানে শেখা সাঁওতালি গান গেয়ে সুর শোনালে। সুরো চাঁপার রূপে মজেছিল এবার গুণে মজল। তারপর কখন দুজনে দুজনের কাছে বললে মনের কথা। আশ্চর্য, দুজনের মনের কথা এক! একটি ঘর। স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে সংসার। শেষ রাত্রে দুজনেই কাঁদলে। অকারণে। তারপর সকাল বেলা চাঁপা বললে—আবার কবে আসবে?

সুরো বলেছিল—আজ তো নড়ছিনে। এখানেই থাকব। যাচ্ছি, বাজারটা করে আনি।

চাঁপা বলেছিল—মাছ মাংস এনো না। সুক্তো করব। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাল লাগবে। নিরিমিষ্যে।

সুরো বলেছিল—মদ?

—এনো। তুমি খাবে আমি না।

—তবে আমিও না!

এ সব কথা চাঁপা পুরোই বলেছিল কাঞ্চনকে। কয়েকবারই তারা এর আগে এসেছে। প্রথমে বার তুই ঘন ঘন এসেছিল। এখন সংসারী তারা। ঘোর সংসারী। তার স্থরু ওই দিন। অর্থাৎ যেদিন চাঁপা স্থরেনকে নিমন্ত্রণ করে ঘরে ডাকলে।

তারপর আর স্থরেন মাস্টার জীবনে চাঁপার ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে যায় নি। শুধু তাই নয়, মাস ছয়েক পর স্থরেন মাস্টার ধুমধাম করে শাস্ত্রমতে এবং আইনমতে চাঁপাকে বিয়ে করেছিল; থিয়েটারের সকলকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিল। তারপরও বছর খানেক থিয়েটারে কাজ করেছিল তুজনে। একসঙ্গে আসত একসঙ্গে যেত—সব থেকে আশ্চর্যের কথা, স্থরেন মাস্টার মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর রূপী এল চাঁপার কোলে। এরপরই চাঁপা এবং স্থরেন তুজনেরই কি হ'ল সে তারাই জানে—আর জানেন গোবিন্দ—হঠাৎ তারা পিছনের জীবনের সঙ্গে সব সংস্রব কাটিয়ে হয়ে গেল পুরো দস্তুর সংসারী সমাজের মানুষ। চাঁপাকে কাজ ছাড়িয়ে স্থরেন মাস্টার উত্তরপাড়ায় অভিনেত্রীদের সমাজ ছেড়ে উঠে গেল দক্ষিণে চাঁপার নিজের বাড়িতে। সকলে ভেবেছিল—সন্তান প্রসবের পর আবার চাঁপা স্টেজে আসবে কিন্তু তা চাঁপা আসে নি। শুধু তাই নয়—বছর তুয়েক পর স্থরেন মাস্টারও থিয়েটারের চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল এবং ব্যবসা শুরু করেছিল। করেছিল কয়লার ডিপো। সেও চাঁপার জোরে। চাঁপা স্থরেনকে পাঠিয়েছিল লালপাহাড়ী—রাজা-সাহেবের কাছে চিঠি লিখে দিয়েছিল। রাজাসাহেব হুকুম দিয়েছিলেন—সেই হুকুমে রাজার দপ্তর থেকে কয়লাকুঠির মালিকদের কাছে চিঠি গিয়েছিল; তারা যথাসম্ভব কম দরে এবং ধারে কয়লা

দিয়েছিল। সুতরাং সুরেন মাস্টারের মত মানুষও তা থেকে লোকসান খায় নি, লাভ করেছিল। কিছুদিনের মধ্যে ওতেই সে পোক্ত হয়ে ডিপো করেছিল বড় করে এবং মানুষটাও পালটে গিয়েছিল। থিয়েটারে নিত্যরাত্রে মাখত রং—পরত পুরনো রঙচঙে পোশাক—তার একেবারে উল্টো—সকাল থেকে রাত্রি সাতটা পর্যন্ত কয়লার কালো ধুলো মেখে এমনই পালটাল যে মাস্টার খেতাব তার উঠে গিয়ে সেটা হয়ে গেল—কয়লাওলা। বাড়ির সামনে খানিকটা জায়গা ছিল—সেইখানে ডিপো আরম্ভ করেছিল, ক্রমে কালিঘাট রেলস্টেশনের পাশে রেলের জায়গা বন্দোবস্ত নিয়ে বড় ডিপো করে সাইনবোর্ড টাঙিয়েছিল—এস. মিটার এ্যাণ্ড সন্স—কোল মারচেন্ট। থিয়েটারের ড্যান্সিং মাষ্টার কোল মারচেন্ট হয়েছিল—থিয়েটারের সখীর দলের সখী—এক দেহব্যবসায়িনীর কন্যা—রাজাসাহেবের রক্ষিতা পতিতা চাঁপা—সেও হয়েছিল গৃহস্থঘরের গৃহিণী এবং পুত্র-কন্যার মা।

ইদানীং তারা কম আসছে। অবসর নেই। ঘর সংসার ছেলে মেয়ে নিয়ে তাদের সংসার সুখের সংসার।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ঝ'রে পড়ল কাঞ্চনমালার বুক থেকে। সেটা পড়ল—তার নিজের কথা ভেবে। চাঁপা এবং সুরেন গৃহস্থ হয়েছে এ কথা সত্য কিন্তু তারা ঘোর বিষয়ী। বছরখানেক আগে যখন কাঞ্চন কলকাতায় গিয়েছিল ডাক্তার দেখাতে তখন ওদের ওখানেই উঠেছিল। মুক্তোকে নিয়ে যায় নি। মুক্তোকে তখনও রেখেছিল মিশনারী বোর্ডিংয়ে। সঙ্গে নিয়ে যায় নি বলে মনে মনে সে গোবিন্দকে প্রণাম জানিয়েছিল। কারণ সেখানে গিয়ে সে যা দেখেছিল তাতে তার তৃপ্তি হয় নি। চাঁপা সুরেনের গৃহস্থালীতে পুরনো কালের পুরনো জীবনের ছাপ মুছে যায় নি। যেন ইচ্ছে করেই তারা মোছে নি।

দেওয়ালে সে কালের থিয়েটারের সাজে এবং ভঙ্গিতে তোলা চাঁপার এবং স্থরেনের ফটো টাঙানো ছিল। চাঁপার ছেলে এবং মেয়ে দুজনেই ইস্কুলে পড়ে, তারা থিয়েটারের গল্পে মশগুল এবং পঞ্চমুখ। স্থরু করে এ কালের ছবির অভিনয় নিয়ে তার সঙ্গে চলে আসে সে কালের গল্প। গিরিশবাবু, অর্দ্ধেন্দু মুস্তাফী, অমৃত বোস, অমৃতমিত্তির, দানীবাবু এমন কি কাশীবাবু, নেপা বোস, অহীন বোস ভাল অভিনেতা না এ কালের শিশিরবাবু, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্তির, ছবি বিশ্বাস ভাল অভিনেতা এই নিয়ে তর্ক প্রায় দৈনন্দিন। অভিনেত্রীদেরও নাম মুখস্ত। বিনোদিনী তারাস্থন্দরী তিনকড়ি থেকে এ কালের কাননবালা চন্দ্রাবতী পদ্মাবতী ছায়াদেবী কার নাম না জানে ওরা! এমন কি হালে এসেছে কে স্থনন্দা দেবী তার নকলও করে দীপা। চাঁপার মেয়ে দীপা। তাদের ঝগড়া হলে স্থরেন মীমাংসা করে দেয়। চাঁপা মীমাংসা করতে যায় না, সে মুখ বাঁকায়। বলে—হুঁঃ—ওই সব আবার এ্যাক্টিং! কি যে সব হচ্ছে কালে কালে।

দেখে শুনে একটু বিস্ময়ের সঙ্গে কাঞ্চন বলেছিল—ঘর পাতিয়ে গেরস্ত হয়েছিস চাঁপা, নিজেরা ও সব পথ ছেড়ে এসেছিস—ছেলে মেয়েকে ও সব কথা নিয়ে মাততে দিস কেন?

চাঁপা বলেছিল—দিদি এখন এ কথা ঘরে ঘরে গো। বামুন যারা গুরু পুরুতের কাজ করে তাদের ঘরেও। লক্ষপতিদের বাড়ীতেও। আমরা তো আমরা।

কাঞ্চন বলেছিল—ঘরে তোর এ্যাক্টিং-এর ফটো রেখেছিস। ছেলে মেয়ে জিজ্ঞাসা করে না?

—করে!

—কি বলিস?

—সে সব গল্প ওরা জানে।

—জানে ?

—ওরে বাপরে, শুনছ না ওদের থিয়েটার সিনেমার গাল গল্প !

—কি ক'রে বলিস ? মানে—গেরস্ত সেজে রয়েছিস তো !

একটু থমকে গিয়েছিল চাঁপা, তারপর বলেছিল—ও কি চাপা থাকে দিদি। জানতে পারেই। তবে এত ভাবি নি কখনও। তা ছাড়া ওদের বাপকে তো জান, সে তো ঢাকাঢাকির ধার ধারে না। সেই নিজে সব গল্প ক'রে বলে। বলে কি কাজ বাবা ঢেকে ঢুকে। এ দিকটা না হয় ঢাকলাম, কিন্তু আমার রক্ত-সে তো ঢাকনি মানবে না।

সুরেনের সঙ্গেও এ নিয়ে কথা হয়েছিল। সে বলেছিল—আমেরও অম্বল হয় আমড়ারও অম্বল হয় কিন্তু তা বলে আম-আমড়া এক নয়। আমি ওদের বলে দিয়েছি, বুঝিয়ে দিয়েছি এই যে টকো টকো স্বাদ তোদের—এ—হল আমড়ার, আমের নয়। চিনি আম আদা মিশিয়ে আমড়াকে আমের অম্বল করা যায়, তা সে সুরো মিত্তিরের পোষাবে না। শালা—ঝঞ্ঝাট কত ? বড় হলে—কা কা—কা—বলেই যখন চেঁচাবে- ডাকবে, তখন বাচ্চা বয়সে কুহু—কুহু—কুহু—ডাক শেখানো ভস্মে ঘি ঢালা। মারে ঝাড়ু শালা কুহুর মুখে কা'—কা'—ই ভাল। বলে এক চোট খুব হেসে নিয়েছিল।

সে দিন কাঞ্চন মনে মনে আঘাত পেয়েছিল। মনে হয়েছিল কথাগুলো সুরেন বোধ হয় তাকেই বলছে। সে আঘাতের খানিকটা ক্রিয়াও হয়েছিল। রাগ হয়েছিল। সে তা সম্বরণ করেছিল গোবিন্দ স্মরণ ক'রে। একটু চু'প ক'রে থেকে হেসে বলেছিল—তা কি হয় সুরেন দা। তা হয় না। সৎ কথা—ভগবৎ কথা—ও হ'ল অমৃত। অমৃত কি নিস্ফল হয় ? উনি বলতেন—কাঞ্চন, সৎকথা হল—অমৃত আর অসৎ কথা হল বিষ। বিষ খেলে আসে যম, মরণ,

অমৃত খেলে আসেন ভগবান। ভগবান দয়া করলে মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে। ছেলে বয়সে সৎশিক্ষা তো অনেক আশার কথা গো—ছেলে বয়সে অসৎ শিক্ষা যারা পায় আমাদের মত—তারাও তো কত জনে গুরুর কৃপায় সৎ শিক্ষা পেয়ে পার হয়ে যায়।

হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকিয়ে বলেছিল—থিয়েটারে সমস্ত জীবনটাই তো কাটল, তা পরমহংস দেবের কৃপায় শিক্ষায়—

হাঁ হাঁ করে উঠে বাধা দিয়ে উঠেছিল সুরেন—জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ! কার কথা যে বল কাঞ্চন—কিসের কথায় কি! সে কি আর কেউ না বলতে পারে। তা আমি বলি নি। আমি বলছি সাধারণ কথা। এই আমাদের কথা, আমার চাঁপার কথা। তোমার কথাও আমাদের কথা নয়। বোস বাবুকে আমি ভাল ক'রে না-জানি, চাঁপার কাছে তাঁর কথা শুনেছি; তোমার জীবনটা তো নিজের চোখে দেখছি। খাঁটি লোক, পরশপাথরের গুণ ছিল। নইলে এমনটা হয়। তোমার মেয়ে—ওর জাত আলাদা হবে—দেখো তুমি।

চাঁপা বলেছিল—তা ব'লে কৃশ্চানদের ইস্কুলে দেওয়া তোমার ঠিক হয় নি দিদি। না-না-না। কি যে ওর বাপ বুঝেছিল আর তুমি যে কি বুঝে সায় দিয়েছিলে। না-না-না।

চুপ ক'রে থেকেছিল কাঞ্চন। এ নিয়ে আর আলোচনা করে নি। নিজের মনেই এ নিয়ে একটি সংশয় তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম কাঁটারমত বলতে গেলে নিরন্তর তাকে বিদ্ধ করত।

আজও রোগশয্যায় শুয়ে সেই কাঁটার খোঁচা সে অনুভব করলে। সেই কাঁটাটা যেন নতুন ক'রে মুখ নিয়ে উঠেছে। সুরেনের কথাই তা হ'লে ঠিক! মুক্তোকে কৃশ্চান ইস্কুলে দেওয়া ঠিক হয় নি।

মুক্তো বললে—তোমার ওই ধর্মকে আমি ঘেন্না করি। ভগবানের নাম ক'রে তোমরা অন্যায় করেছ।

ওঃ তার শেষ কথাগুলো কি কঠিন কি নিষ্ঠুর, তাতে কি ঘেন্না! ওঃ!

ক' ফোঁটা জল শীর্ণ মুখখানি বেয়ে গড়িয়ে পড়েছিল। ভাবনা তো তার নিজের জন্য নয়—ওই মেয়ের জন্যে। পাপ পুণ্যের বিচার করতে গিয়ে যারা বাপ মাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করায় তারা দুনিয়ার কাছে আর যা পাবে পাক, ভালবাসা তো পায় না। তা ছাড়া সে সেখানে গিয়ে তাঁকে বলবে কি? তিনি তো দাঁড়িয়ে আছেন প্রতীক্ষা করে। নিশ্চয় আছেন। তিনি যখন বলবেন— কাঞ্চন, মুক্তোর নিশ্বাসগুলি এত তপ্ত কেন বলতে পার? সেগুলি আমার বুকে এসে লাগে আর ঝলসে দেয়।

কি বলবে সে?

পরের দিন সকালে কাঞ্চন বসেছিল উঠে। নিজেই কোন মতে কষ্ট ক'রে উঠে পিঠের দিকে বালিশগুলি গাদা ক'রে তাতে ঠেস দিয়ে বসে হাঁপাচ্ছিল। সকালে অনেক কালের বাউড়ী ঝিটি আসে, তার মমতা আছে সে কাজ ছাড়ে নি, সেই সব পরিষ্কার ক'রে দিয়ে যায়। চাদর কাপড় সেই কাচে। মুক্তোকে করতে হয় না। কাঞ্চনও চায় না, ওই ঝিটিও দেয় না। মুক্তো এসে মুখ ধোওয়ার জল, মাজন, জিভ ছোলা দিয়ে সামনে ব'সে খল নুড়ি নিয়ে কবিরাজী ওষুদ মাড়তে বসে। ওষুদ খাইয়ে একটু ছানা, কয়েক টুকরো কলা কেটে মাকে খাইয়ে তবে যায়। নিচে গিয়ে রান্নাবান্না করে। নইলে কে করবে? মুক্তোর রান্না মুক্তোর নিজের জন্যে। সাহায্য ওই ঝিটিই করে। আগে একটি বৈষ্ণবের মেয়ে ছিল তাকে জবাব দিতে হয়েছে কিছুদিন

হ'ল। জবাব মুক্তোই দিয়েছে। বলেছে এত জাত কেন? ইস্কুলে তো জাত বিচার নেই। সেখানে তো জল খাই। বাড়ীতে এত ভড়ং কেন?

মেনে নিতে হয়েছে কাঞ্চনকে। বোসবাবু কাঞ্চনের প্রভু, স্বামী, তিনিও জাত মানতেন না। বলতেন বৈষ্ণবের কাছে জাতি বিচার নেই। শুধু মানুষের দুটি জাত কাঞ্চন। সৎ মানে ভাল মানুষ, অসৎ মানে মন্দ মানুষ। ওই হল আসল সদ্‌জাতি আর অসদ্‌ জাতি। তবু কাঞ্চন তার সবটা মানতে পারে নি। সে হিন্দু অহিন্দু মানত এবং মানে। সে নিরামিষ খায় তার দীক্ষার পর থেকে, মেয়ে মাছ খায়। যে বৈষ্ণব মেয়েটি রান্না করত, মুক্তো ছুটিতে বাড়ী এলে, সে তার জন্যে আলাদা মাছ রান্না ক'রে দিত। স্নান ক'রে রান্না করত। জাত বিচার ধর্মের নিয়মে না-মানলেও, সদাচার কদাচারের জাত মানত। এবং এ মানাটা তার তো আজকের নয়, অনেক দিনের। কলকাতায় যারা দেহ নিয়ে ব্যবসা করে তারা এটাকে বিচিত্র ভাবে মানে। বর্দ্ধমানে তো আজও রয়েছে সে মানা। রাত্রে ব্যবসার জন্য তারা যা করুক, সকালে স্নান সেরে তারা শুদ্ধ হয়ে যেত। তাদেরও ঠাকুর ঘর ছিল—আজও আছে—সে ঘরে কখনও কোন অনাচার ঢুকতে পায় নি। মনের মধ্যেও তেমনি একটা ঘর আছে তাদের। হয় বয়সের সঙ্গে নয় অন্য কোনও সুযোগে সে ঘরের ধূপের গন্ধ বেরিয়ে বাইরের অপর সকল ঘরের সকল গন্ধ সেণ্ট ল্যাভেণ্ডার পাউডার গন্ধতেল হুইস্কি ব্র্যাণ্ডি ধেনো মদের গন্ধ আচ্ছন্ন করে দেয়।

কাঞ্চনের সারা জগতটা ধূপের গন্ধে ছেয়ে গেছে। তার কি একার? কত জনের, কতজনের, কে হিসেব রাখে তার? কত জন সন্ন্যাসিনী হয়ে গেছে। এই তো গতবারে চাঁপা স্মরেন এসে বলে—দিদি আশ্চর্য শুনেছ, শিশিরকনা দি' হরিদ্বারে এক আশ্রমে গিয়েছে; সেখানে এঁটো বাসন মাজার কাজ নিয়েছে!

শিশিরকণা বাংলা থিয়েটারের দমকা হাওয়া। নাচে গানে হাস্যে লাস্যে সে ছিল পাগলাঝোরা। শেষ পর্যন্ত মস্ত এ্যাক্‌ট্রেস হয়েছিল। শুধু তাই নয়—গোটা একটা থিয়েটারের প্রায় মালিক—; মালিকের গৃহিনী। কত ধনী, কত বাবু, কত এ্যাক্টর যে শিশিরকণার জন্যে পাগল হয়েছিল তার হিসেব নেই। মদ—মজলিস—হাসি—রঙ্গ—এই ছিল তার জীবন। সে—; সে বাসন মাজতে গেল হরিদ্বারে এক আশ্রমে! হরি! হরি! হরি!

কথাটা শুনে কাঞ্চন মনে মনে হরিকে ডেকেছিল। আর কাকে ডাকবে! এ আর সে ছাড়া কার খেলা!

মুক্তো এ সব মানে না। অবশ্য এ সব কথা মুক্তোর কাছে সযত্নে সে ঢেকেই রেখেছিল। জানতে দেয় নি, আজ জানালে! জেনে সে তাকে ঘেন্না ক'রে বেরিয়ে গেল! তাকে ঘেন্না করুক ক্ষতি নেই। সে তো সত্যই কলঙ্কিনী। কলঙ্ক তো কোন জনকে ভালবাসায় নয়! কলঙ্ক ব্যাভিচারে। ব্যাভিচার তার তো একদিনের পেশা ছিল, নেশাও ছিল ঃ ঘেন্না তার প্রাপ্য। কিন্তু মুক্তো তার বাপকে, তাঁর মত মানুষকে ঘেন্না করলে!

চোখ দুটি তার আবার জলে ভ'রে গেল। চোখ মুছলে। না মুছে উপায় কি! ওঃ, সকাল থেকে এল না মুক্তো! জল মাজন জিভছোলা দিলে না! না দিক, সে দেওয়াল ধরে উঠল। আস্তে আস্তে গিয়ে সে গুলি নামিয়ে জলের ঘটিটা টেনে নিয়ে মুখ ধুতে বসল।

মুখ ধোয়ার শব্দে মুক্তো এসে দাঁড়াল।

—তুমি নিজেই নিয়েছো? আমাকে ডাকতে হ'ত। এমন ক'রে—

—তা হোক। পেরেছি তো!

—পারবে না কেন? কিন্তু আমি রয়েছি।

—কত আর করবি বাছা? তা ছাড়া সুখ দুঃখ তো সবারই

আছে। তোর সেই কাল থেকে—। কে এল দেখ তো? সাইকেল রিক্সার ঘণ্টা বাজছে দোরে! হয় তো চাঁপা এল! দেখ।

হ্যাঁ। চাঁপাই বটে! সুরেনের গলা শোনা যাচ্ছে। রিক্সাওলার সঙ্গে ভাড়া নিয়ে তকরার জুড়েছে।

—তার চেয়ে তুমি রিক্সায় চড় বাওয়া—আমি চালিয়ে তোমাকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসি। আমাকে তুমি বারো আনা চাচ্ছ—ছ আনা দিয়ো। এই পথ টুকুর জন্যে বারো আনা! এর চেয়ে যে আলিবাবার চিচিং ফাঁকের গুহার ধন সস্তা মানিক! নাও—নাও। ওই অষ্টগণ্ডাতেই রফা কর।

চাঁপা ঘরে ঢুকে কাঞ্চনের অবস্থা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। সেই দিদি—এমন হয়ে গেছে। এ যে যাবার জন্যে সেজেছে বললেই হয়! তার মুখ থেকে শুধু একটি কথা বের হয়েছিল, ভয়ে—বিস্ময়ে—আনন্দে সব কিছুর মধ্যেই কথা হারিয়ে সর্বপ্রথম যে কথাটি ফিরে পায়। ও—মা!

তারপরই সে কেঁদে ফেলেছিল।

কাঞ্চন হেসে বলেছিল—কাঁদছিস? কেঁদে কি করবি? কাঁদিসনে।

তবু চাঁপা কেঁদেছিল।

কাঞ্চন আবার বলেছিল—আমি কাঁদি নি। তুই কাঁদবি কেন? তোরা শুধু আমাকে একজনকে হারাবি। আমি তো তোদের সকলকে হারাব। কাঁদিস নে রে। বড় কষ্ট পাচ্ছি। এ থেকে খালাস পাব এবার।

ঠিক এই সময়টিতেই সুরেন ভাড়ার কোন্দল মিটিয়ে উত্তপ্ত পদক্ষেপের শব্দ তুলে সিঁড়ি ভেঙে দরজার মুখে দাঁড়িয়েছিল। সে—যে—সে—সেও হতবাক হয়ে গিয়েছিল। কাঞ্চনই বলেছিল—এস বস। তারপর হেসে বলেছিল—ভয় পাচ্ছ দেখে?

সুরেন বিহ্বলতার প্রভাবে মৃদুস্বরে বলেছিল—এমন হয়ে গেছ?

—যাবার একটা সাজ আছে সুরেনদা! মনে কর থিয়েটারে যাবার সাজ! তা যেখানে যাব, সেখানকার সাজ যে এমনি। এস বস!

মুক্তোও এসে দাঁড়িয়েছিল—মেসোর পেছনে। কথা বলে নি। মাসী ও মেসো এসেছে সে তা উঠোনের দিক থেকে দেখেছে। কাল রাত্রে মায়ের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনের পশ্চাদপট যেন একটা আকস্মিক ঝড়ের আঘাতে ছিঁড়ে খুঁড়ে তছনচ করে দিয়ে চলে গেল এবং সে দেখলে তার জীবনের আসল পটভূমি—যে পটভূমিকে সে মিশনারী ইস্কুলে পড়ে ঘৃণা করে এসেছে—যেখানে ছড়ানো আছে মদের বোতল—যেখানে পড়ে আছে পানোন্মত্ত নারীদেহ, অসাড় মাংসপিণ্ডের মত। যেখানকার শব্দজগতে বেজে বেজে উঠছে—স্খলিত চরণের ঘুঙুরের শব্দ, মধ্যে মধ্যে কুৎসিৎ অশ্লীল কথা গালিগালাজ যাতে সুর সঙ্গীত এমন কি তার মায়ের চোখের জল-ফেলে-গাওয়া কীর্তন গান পর্যন্ত কুৎসিৎ ও কলুষিত মনে হয়। তার কিশোর মনে এ আঘাত নিষ্ঠুর, অতিনিষ্ঠুর হয়েছিল; মায়ের উপর রাগ হয়েছিল—নিজের উপর ঘৃণা হয়েছিল—বাইরের সকল কিছুর মধ্যে একটা আতঙ্ক যেন রূঢ় কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকে শাসন করেছিল। সকাল থেকে উঠে তাই সে রান্নাশালের দিকে চুপ ক'রে বসেছিল। যে ঝিটা কাজ করতে আসে সে কাজ করে যাচ্ছিল এবং তার দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে প্রশ্ন করছিল—কি হ'ল গো মুক্তো মা? এমন ক'রে কেন গা?

উত্তর দেয় নি মুক্তো। সে আবার প্রশ্ন করেছিল—মায়ের জন্য এত ভেব না। ও ডাক্তার বদ্যিরা যা বলে বলুক। আমি বলি কি জান? মা কালী—ওইযে—সব্বানপুরের মা কালী—ওই থানে চল আমার সঙ্গে চান ক'রে সোঁ-চুলে সোঁ-কাপড়ে পেনাম করে মানত করে চরণামেরতো আর মিত্তিকে নিয়ে এস—মাকে দাও—ভাল হয়ে

যাবে। এই দেখ আমার—আমার একবার সুতিকা ব্যামো হয়ে এমনি দশায় মরতে বসেছিনু, তা ওই—ওই মায়ের থানে গিয়ে পড়নু, বন্নু মা—যা হয় কর। যদি ভাল না কর মা—তোমার মহিমে যাবে। অপযশ হবে। ভাল কর, পাঁঠা বলি দেব—পূজো দেব। তা দেখ—বেঁচে গেনু। জলজ্যান্ত কাজ করছি।

ঠিক এই সময়েই মাসীরা এসে পৌঁছল। ঝি বেরিয়ে গিয়ে জিনিষপত্র নামিয়ে নিলে, এবং এক ফাঁকে এদিকে এসে তাকে সজাগ করে দিলে। তোমার মাসী মেসো এয়েচে মুক্তো। ওঠ—এমন ক'রে ব'সে থাকে না।

তারপরই সে একটু এগিয়ে এসে প্রশ্ন করেছিল—এই তোমার সেই চাঁপা মাসী না মুক্তো? আর ওই তো সুরো মাষ্টার?

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিল মুক্তো—হ্যাঁ।

তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছিল মুক্তো। উঠতেই হবে। ঘরের দোরে—সুরেন মেসোর পিছনে এসে দাঁড়াতেই চাঁপা মাসী তাকে দেখেছিল। দেখে বলেছিল, আয় মুক্তো আয়। ওগো সর না একটু। মুক্তো তোমার পিছনে দাঁড়িয়ে। আসতে দাও ওকে।

সুরেন মেসো পিছন ফিরে মুক্তোকে বলেছিল, এই মুক্তো? মিস্ পার্ল? বাঃ। দিব্যি মেয়ে। সঙ্কুচিত এবং বিরক্ত হয়েছিল মুক্তো। কিন্তু পরক্ষণেই সুরেন বলেছিল—এ তো বড় ঘরের মেয়ের মত বেশ সম্ভ্রমের মেয়ে হয়েছে, কাঞ্চন। বা বা বা! গতবার যখন দেখেছিলাম তখন ছোট ছিল। অনেক ছোট! এতো একটু মাজলে ঘষলে সিনেমায়—

চাঁপা ধমক দিয়ে বলেছিল—কি যা তা বল'! কোন কাণ্ডজ্ঞান কি কোন কালে হবে না! আয়রে মুক্তো—আয়। মায়ের কাছে বস।

কাঞ্চন তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—না। ওর এখন

অনেক কাজ। তোদের চা দেবে, সুরেনদাকে কিছু খেতে দিতে হবে। আমি তো জানি ওর ভোর বেলা ক্ষিদে পায়।

সুরেন মেসো হেসে উঠেছিল। —মনে আছে তোমার ?

—তা নেই !

—কিন্তু সে অভ্যেস আর নেই। গতবার সব মন্তর নিয়েছি তো। তা গুরু বলেছিল, অনুমতি রইল তুমি খেয়ো। খেয়ে দেয়েই যখন হোক একবার তাঁকে ডেকো। তা বুঝেছ কাঞ্চন—ক্রমে ক্রমে না সাপ যেমন করে ব্যাঙ ধ'রে একটু একটু ক'রে কায়দা করে না—ঠিক তেমনি ভাবেই কায়দা করে ফেলেছে ঈষ্টমন্ত্র। তবে চা-টা খাই ! দে বাবা মুক্তো চা- টা দে।

চলে আসছিল মুক্তো। সুরেন মেসোর কথা তার ভাল লাগেনি। আগেও লাগেনি যখন বছরখানেক আগে এদের দেখেছিল—কিন্তু তখন এদের জীবনের নগ্ন সত্যটা, আসল রূপটা জানতে পারেনি। তখন যে সব কথাবার্তাকে ভাবভঙ্গিকে—অজ্ঞতা বা গ্রাম্যতা বলে ক্ষমা করে গ্রহণ করেছিল আজ সে সবই-তার কাছে অশ্লীল, অশুদ্ধ, অপবিত্র বলে মনে হচ্ছে। চলে আসতে আসতে সে সিঁড়িতে দাঁড়াল। সুরেন মেসো তার স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে বলছে—কেন—কি—বললাম কি ? ভাগবত অশুদ্ধ হ'ল কিসে ? যত সব—

চাঁপা মাসী বললে—চেঁচিও না।

—নে বাবাঃ এও চেঁচানি হল ?

মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—না—না। মানে—ওকে সিনেমা টিনেমার কথা বলো না। মিশনারী ইস্কুলে পড়ে তো। এ সবকে—বুঝেছ।

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললে কাঞ্চন—কাল আমি ওকে সব বলেছি। আমি কি, ওর বাপ—মানে সব কথা। কোন কথাই লুকুই নি।

—ভাল করেছ। খু—ব ভাল করেছ—

—কিন্তু—

—এতে আবার কিন্তু কি আছে? কাল বদ্‌লেছে—তার ওপর ভগবান দয়া করেছিলেন তোমাকে—বোসবাবুর মত ভক্ত লোক ভাল লোকের ভালবাসা পেয়েছিলে—তিনি টাকা দিয়ে গিয়েছেন—তাই আজ মিশনারী ইস্কুলে পড়ছে। নইলে তো এতদিন থিয়েটারের গাড়ী আসত—ছুটতে হ'ত। কোমর বেঁধে এক দুই তিন—এক দুই তিন—গুনে ধিন তাক তাক করতে হ'ত। হয়তো ঠেলে জানালার ধারে খোঁপায় মালা জড়িয়ে দাঁড়াতে হত।

কাঞ্চন বললে—হয় তো হ'ত সুরেন দা। কিন্তু মুক্তো আর তা' হবে না। কিন্তু বলে তাই বলতে যাচ্ছিলাম তোমাদের।

সে বলতে লাগল মুক্তোর কথাগুলি, বললে—বললে কি জান—তোমার ওই ধম্মকে আমি ঘেন্না করি। ভগবানের নাম ক'রে তোমরা অন্যায় করেছ। ভগবানও তোমাদের ক্ষমা করবেন না। ছি—ছি! আমার পরিচয়টা কি বলতে পার মা? তারপর—। কণ্ঠ বোধ করি রুদ্ধ হয়ে গেল কাঞ্চনের।

মুক্তোর মনে পড়ল নিজের বলা কথাগুলি।

—সে পরিচয় আমি আমার পরিচয় থেকে মুছে দেব। আমি দাসীর মেয়ে নই—কোন ভণ্ড প্রভুর মেয়ে নই। আমি কারুর দাসী হব না। আমি মানুষ। আমি মেয়ে। তাই আমার সব।

তুড় তুড় করে সে সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলে গেল।

ঘরের দরজা খুলে চাঁপা মাসী বেরিয়ে এসে ডাকলে—মুক্তো! মুক্তো!

মুক্তো তখন উনোনের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। কেৎলিটা খুঁজছিল—চড়িয়ে দেবে চায়ের জল। উত্তর দিয়েছিল—জল চড়িয়েছি চায়ের।

কাঞ্চন সেই দিনই এক সময় হঠাৎ ঘাড় লুটিয়ে বালিশের উপর কাত হয়ে পড়ে গিয়ে আর ওঠে নি। মুক্তো তখনও কাছে ছিল না। সে পাশের ঘরে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। বালিকা বয়স তখন কাটছে বা কেটেছে, কৈশোরের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের অনেক কিছু শুনে শুধু পাখীর মতই শেখে নি—অনুভবে আন্দাজে মনে মনেও বুঝছে। বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে সে সেদিন আশ্চর্য লজ্জা এবং দীনতা অনুভব করেছিল সে। তার কান্না পাচ্ছিল।

ঠিক এই সময়েই চাঁপা মাসী আর্তস্বরে ডেকে উঠেছিল—দিদি! দিদি!

সেও চমকে উঠেছিল। এবং শুনতে চেষ্টা করেছিল—মা কি বলছে। মায়ের কোন কথা শুনতে পায়নি। তার বদলে মাসীই আবার চীৎকার করেছিল—ওগো, শুনছ—ওগো! দেখ কি হল?

মেসো ডেকেছিল—মুক্তো! মুক্তো! মুক্তো কই!

মুক্তোর পা বুক কেঁপে উঠেছিল থর থর ক'রে। সে কোন রকমে এসে দাঁড়িয়েছিল মায়ের ঘরের দরজায়। মা চেয়ে রয়েছে—কিন্তু কথা বলতে পারছে না। চোখের দৃষ্টি যেন কেমন! তবু তার মধ্যে চেনার চিহ্ন ছিল।

চাঁপা মাসী বলেছিল—আয় আয় পাশে বোস। দে দে—মুখে দুধগঙ্গাজল দে। দুধ কই—গঙ্গাজল কই!

সে পাশে চুপ করে বসেই ছিল। দুধ গঙ্গাজল আনতে আনতে মায়ের চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে গিয়েছিল।

সে পাথরের মত বসেছিল। মা বলে একবারও ফুক্‌রে ডেকে ওঠেনি। ওঠেনি নয় উঠতে পারেনি চেষ্টা করেও।

দ্বিতীয় পর্ব

(মুক্তামালার কথা)

এক

১৯৫৪ সাল। বারো বৎসর পর। মুক্তামালা এখন ছাব্বিশ বছরের পূর্ণযুবতী। সে দুঃখে নেই—তার জীবনের চারিপাশে এরই মধ্যে যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রাচুর্য। মুক্তামালা নৃত্যকলায় খ্যাতি পেয়েছে অনেক—শুধু বাংলাদেশেই নয়—ভারতবর্ষেই নয়—এই বয়সে সে বাইরের দেশ ঘুরে এসেছে। গানেও তার যথেষ্ট খ্যাতি। তার নাম এখন মুক্তামালা নয়, মুক্তি; এবং বাপের বোস উপাধি সে নেয় নি—মায়ের মাতৃ-উপাধি সে কালের দাসীকে সে দাস করে নিয়েছে। দীর্ঘাঙ্গী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, টানা দুটি চোখ—শ্রীময়ী মেয়ে—নৃত্যকলার উপযুক্ত করেই যেন তার দেহখানিকে কেউ গড়েছিল—কিন্তু সব থেকে আকর্ষণ করে তার দৃষ্টির একটি বিষণ্ণতা। অন্যমনস্কতার সঙ্গে একটি উদাসীনতা যেন বর্ষার রাত্রের মধ্য-আকাশের চাঁদের পরিপূর্ণ আলোর উপর দিগন্তের কালোমেঘের মত একটি ছায়া ফেলেছে। জীবনে সে একাই একরকম। থাকবার মধ্যে চাঁপা মাসীর ছেলে রূপেন, ডাক নাম রূপী—সে থাকে। সেই তার ভরণ-পোষণ করে; রূপেন বয়সে তারই বয়সী প্রায়; লেখাপড়া তেমন শেখেনি; বারদুয়েক ম্যাট্রিক ফেল করে বসেই আছে। বাড়িটা ওরই, অর্থাৎ চাঁপা মাসীরই বাড়ি; নিচের তলায় ভাড়াটে আছে একঘর, মাসে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া পায়। মুক্তার কাছে ভাড়া চায় না—নেয় না, মুক্তার টাকাতেই তার বাকী খরচ চলে যায়।

হিসেবে সেটা ভাড়ার চেয়ে বেশীই পড়ে। রূপী ঠিক হিসেব করে ভাড়া ছেড়ে দেয় তা নয়, অন্তর থেকেই সে নেয় না, নিজের বোনের থেকে বেশী মনে করে মুক্তাকে।

সংসারে রূপেনের কাছেই সে মধুর এবং কোমল—বাকী দুনিয়ার কাছে সে তিক্ত, রূঢ় এবং নিষ্ঠুর। দৃষ্টিতে তার এমন যে একটি বিষণ্ণতা, যা দেখে মানুষ আকৃষ্ট হয়, কাছে এগিয়ে আসে; যখন সে দৃষ্টি তার ঘৃণায় রূঢ়তায় এমন তীব্র হয়ে ওঠে যাতে কাছে আসা মানুষের অন্তর আগুনের জ্বালার মত একটা জ্বালা অনুভব করে। তারা বাধ্য হলে দূরে সরে যায়। আশ্চর্য। একটা আশ্চর্য—তার জীবনে বিচিত্রভাবে ফুটে উঠেছে।

জীবনে সে নাচ গানকে দূরেই রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু তা হল না শেষ পর্যন্ত। আশ্চর্যভাবে সে এসে পড়ল এই নাচ গানের কাছেই। নাচ গানে খ্যাতি তার হয়েছে কিন্তু মনে মনে নিজের উপরেই সে বিরক্ত। এ যেন তার ভাগ্যের কাছে না হোক জন্মের কাছে হার মানা হয়েছে। মায়ের সকল সম্পর্ক থেকেই দূরে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু হল না।

এতকাল পরে ঘরে বসে বিষণ্ণ অবসরে বসে এই আশ্চর্য সংঘটনের কথাই ভাবছিল সে। মনে পড়ছে তার সব।

এর জন্য আজও সে ভাবে, মনে করে—দায়ী তার বাপ, তার মা। শুধু কি তারাই? সংসারে ওই অপরাধে অপরাধী ক'রে মানুষ ঠেলে তাকে এই কাজেই এনে দিলে।

ওঃ, মায়ের মৃত্যুর পরই—সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে—শ্মশানে—!

শ্মশানে মৃতের নাম লেখাতে হয়! সেইখানে খাতায় লিখবার সময় প্রকাশ হয়ে গেল—কাঞ্চনমালা—ভক্তিমতী কীর্তনগায়িকার পিতৃপরিচয় নেই, সে দেহব্যবসায়িনীর কন্যা—দেহব্যবসায়িনী—

উকীল বোসবাবুর রক্ষিতা। এবং সেই সঙ্গে প্রকাশ হল মুক্তামালার পরিচয়।

সারাটা ক্ষণ মুক্তা মাটির দিকে চেয়ে বসে ছিল। মনে হচ্ছিল শ্মশানের লোকগুলি তার দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসছে।

তখনও বুঝবার ঠিক সময় হয় নি। তখন বুঝতে পারে নি কিন্তু আজ বোঝে। তার বাপ মা তার প্রতি স্নেহবশে—? না—শুধু স্নেহবশে কখনও নয়—তাঁদের এই ভালবাসাকে তাঁরা দুজনেই পুণ্যের মূল্য দিতে পারেন নি তাই তার পরিচয়ের সঙ্গে তাঁদের সেই ভালবাসার কথাও গোপন করেছিলেন। অত্যন্ত সযত্নে। উকীলী চাতুর্যের সঙ্গে চারিদিকে এমন করে ঢেকে দিতে চেয়েছিলেন যে কোন দিক থেকে যেন একবিন্দু আলো না-পড়ে তার ওপর।

তার মা সেদিন শেষ কথাটা খাঁটি সত্য বলেছিল—আমি তাঁর দাসী। তিনি আমার প্রভু। ভালবেসে তাঁর চরণে বিকিয়েছিলাম।

খাঁটি সত্য। এবং তার বাপ প্রভুদের চিরাচরিত নীতি অনুযায়ী তাকে দাসীর অধিকার ছাড়া আর কিছু দেন নি। মধ্যযুগে রাজা-মহারাজা, নবাব-বাদশা, দস্যুসর্দার, গুরু, সমাজপতিরা এই প্রভুনীতি--না, নীতি নয় প্রভুধর্মকে জীবধর্মের স্বাভাবিক নিয়মে আবিষ্কার করেছিল ; তাদের চারিপাশে থাকত নারীর দল—দাসী—সবাই ছিল দাসী। যাদের পিছনে বাপের জোর থাকত তারা ছিল পত্নী, বাকীরা ছিল উপপত্নী। কেউ হাটে কেনা—কেউ ধরে আনা—কেউ বা নিজেই বিকোত। ওই তার মায়ের মত বিকোত নিজেকে। এদের সন্তান-সন্ততিরা এ দুনিয়ায় জন্ম নিত কুক্কুরীর শাবকের মত ; বড় বাড়িটার কোন এক প্রকাণ্ড উনোনের ছাই অথবা খড়কুটোর গাদায় জন্মাত, মায়ের যত্নে, তার দুধে মানুষ হত ; শৈশব লাবণ্যের জোরে করুণা পেয়ে উচ্ছিষ্ট পেত। বড় হত। তারপর ঘর হতে বিতাড়িত হত। পথে

ঘুরত! না খেয়ে মরত। কেউ মারা পড়ত মাথায় ডাণ্ডা খেয়ে কেউ মরত জলাতঙ্কে পাগল হয়ে। জন্তুর রাজ্যে যে নিয়ম, মানুষের রাজ্যেও সেই নিয়ম—এক—এক, কোন প্রভেদ নেই। মানুষ বুদ্ধিমান জন্তু, সে কাপড় পরে জামা পরে—অর্থাৎ সে আবরণের কৌশল জানে, তাই নারী পুরুষের সেই আদিম সম্পর্কের উপর সে একটা আবরণ দিয়েছে। চেলি মালা টোপরের আবরণ।

তার জন্মদাতা—তার মায়ের প্রভু—তাকে তাঁর প্রভুধর্মের ছলনা করে গিয়েছিলেন। দাসী—তার মা—সেই ছলনাকেই ভালবাসা বলে মনে করেছিল। হায় দাসীর দল!

তার জন্মদাতা একখানা দলিল করে তার জন্যে ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে সব লিখে পড়ে ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন সে দলিল তার কাছেই আছে। তাতে দাতা তিনি—গৃহীতা মা। "তুমি এবং আমি উভয়ে প্রণয়াসক্ত হইয়াছিলাম—আমি দুরন্ত ক্যান্সার ব্যাধিগ্রস্ত হইলে তুমি একান্ত নিষ্ঠার সহিত আমার সেবা পরিচর্যা করিয়াছ; এবং আমাদের উভয়ের সাহচর্যের ফলে আমাদের একটি কন্যাসন্তান জন্মিয়াছে। ন্যায়তঃ ধর্মতঃ তোমাদের উভয়ের ভরণ-পোষণ আমার দায়িত্ব। আমার যে ব্যাধি হইয়াছে তাহাতে আমার যে কোন দিন মৃত্যু হইতে পারে এই উপলব্ধি করিয়া অতি বিচক্ষণ বিবেচনা ও বিচার করিয়া তোমাদের জন্য নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা করিয়া যাইতেছি!"

এরপর ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক ধর্মকথা বলে বলেছেন—তোমাদের মা এবং মেয়ের জন্য পাঁচ হাজার টাকা হিসেবে দশ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা রইল। এই টাকার অর্ধেক—যা মুক্তামালার জন্য—সেটার প্রথম পাঁচ বছর খরচ হবে না—তারপর অর্থাৎ মুক্তামালার সাত বছর বয়স থেকে তার পড়ার জন্য খরচ হবে। তাকে কোন মিশনারী ইস্কুলের বোর্ডিংয়ে রাখতে হবে। কারণ এ দেশের সমাজ-ব্যবস্থায়

সাধারণ ইস্কুলে মুক্তামালার মত পরিচয় যাদের তাদের অনেক অসুবিধা। পড়ার খরচ সংকুলান হয়ে যদি কোন টাকা থাকে সেটা মুক্তামালা পাবে।

মুক্তামালা সাত বছর বয়স থেকেই মিশনারী বোর্ডিংয়ে থেকেছে! সাত বছর থেকে বারো বছর পর্যন্ত থেকেছে। তারপর মুক্তামালার মুক্তি, তার সৌভাগ্য ব্যাঙ্কটা ফেল পড়ে টাকাটা গেল। মায়ের তখন অসুখেরও শুরু। ওখানেই ইস্কুলে ভরতি হয়েছিল। সেখান থেকেই সে এর আঁচ পেতে লাগল। তারপর একদিন স্বয়ং তার মা—তার মুখের সামনে পরিচয়ের বারুদের আগুন ধরিয়ে দিনের আলোর মত আলো জ্বেলে—সামনে ধরলে আয়না। ভাবলে রোশনাইয়ে তার মুখখানা অপরূপ দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। কিন্তু আসলে ওই বারুদের আলোতে তার মুখখানা পুড়ে ঝলসে গেল।

যাক পোড়ামুখের উপর মুখোশ বা রঙ সে লাগাবে না। সে ঢাকবে না। কিছুই ঢাকবে না। তার জন্মদাতা—তার মায়ের থেকে চাঁপা মাসী ভাল। অনেক ভাল। সহজ ওরা। চাঁপা মাসীর হরিভক্তি নেই—কিংবা চাঁপা মাসী যে সুরেন মেসোকে নিয়ে ঘর বেঁধেছে তারও ওসব হরিভক্তি বা কালীভক্তি বা কোন ধর্ম-বাইই নেই।

*　　*　　*　　*

শ্মশান থেকে ফিরতে হয়েছিল প্রায় রাত্রি নটা।

নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল সারারাত্রি। মাসী অনেকক্ষণ জেগেছিল কিন্তু মেসো ঘুমিয়েছিল। সুরেন মেসো আশ্চর্য সহজ মানুষ। মায়ের অসুখের শেষ দিনে এসে পৌঁচেছিল! সারাটা দিন আশ্চর্য সেবা সে করেছিল। মল মূত্র থেকে সব দু হাতে পরিষ্কার করেছে—কারও মানা শোনে নি। শ্মশানেও সেই সব করেছে। তারপর এসে শুয়েছে এবং অঘোরে ঘুমিয়েছে। মুক্তা জেগেছিল। একা জানালার

ধারে বসে তাকিয়েছিল বাইরের দিকে। ঘুমন্ত শহর—উপরে নক্ষত্র-ভরা আকাশ—তার নিচে অন্ধকার, শহরের এখানে ওখানে আলোর ছটা; নিস্তব্ধ ইঁটকাঠের স্তূপ। মাথার মধ্যে সব যেন শূন্য হয়ে গিয়েছিল। ছিল একটা অবসন্নতা! কিন্তু তবু ঘুম আসে নি। মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন উঠছিল—এর পর?

এর পর সে চলে যাবে সেই কৃশ্চান মিশনের ইস্কুলে। সেখানে গিয়ে সব বলবে। তার জীবনের সব কথা। তার পর কৃশ্চান হবে। ওখানেই পড়বে। তারপর নিজের একটা পথ সে করে নেবে। এ পথ নয়; নাচগানের পথ নয়। কিন্তু এতেই তার একটা জন্মগত অধিকার আছে। গান সে শুনবামাত্র শিখতে পারে। তা হোক—এ পথে সে হাঁটবে না। না!

স্থির তাই করেছিল কিন্তু কাজে পরিণত করা তো সহজ নয়। সংসারে আসবাবপত্র বাড়িটা আর শতখানেক টাকা ছাড়া আর কিছু ছিল না। চৌদ্দ পনের বছরের কুমারী মেয়ে—সংসারে একা। কৃশ্চান মিশনে যেতে চেয়েও তার যাওয়া হয় নি। চাঁপা মাসী, স্থুরেন মেসো দেয় নি। আসবাবপত্র সামান্য, বেচে আশী টাকা পাওয়া গিয়েছিল। বাড়ির ব্যবস্থা পরে হবে, ভেবেচিন্তে করা ভাল এই স্থির করে চাঁপা মাসী আর স্থুরেন মেসো তাকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করলে সে বলেছিল—আমার টাকাটা আমাকে দাও মাসী। আমি আসানসোলে গিয়ে মিশন ইস্কুলে ভরতি হব।

—মিশন ইস্কুলে ভরতি হবি কি? আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল চাঁপা মাসী।

—হ্যাঁ। মায়ের মৃত্যুর আগে থেকেই আমি ঠিক করে রেখেছি।

—কই দিদি তো তা বলে নি কিছু।

—না। মা বলে নি। আমি ঠিক করে রেখেছি।

—তুই ঠিক করে রেখেছিস কি ? তোর ঠিক করার মানে কি ? তোর কি ভালমন্দ বুঝবার বয়স হয়েছে যে তুই কৃশ্চান ইস্কুলে পড়বি! খরচ যোগাবে কে ?

—কৃশ্চান হয়ে গেলে—বাপ মা না থাকলে ওরা খরচ নেয় না।

—পড়বার খরচের জন্যে তোকে ভাবতে হবে না। আমার একটা ছেলে একটা মেয়ে আছে, তারা পড়ছে তুইও পড়বি। এই বাড়ি বিক্রী হলে কিছু টাকা তোর আসবে ! পড়বার জন্যে জাত দিবি কি? এমন কথাও তো কোথাও শুনি নি।

সে চুপ করে গিয়েছিল—তার মাকে মুখের উপর যা বলতে পেরেছিল তা মাসীকে বলতে পারে নি। একবার ভেবেছিল সে পালিয়ে যাবে আসানসোল এবং কৃশ্চান মিশনে গিয়ে উঠবে। কিন্তু তাও সে পারেনি। অসহায় বোধ হয়েছিল নিজেকে।

কলকাতাতেই আসতে হয়েছিল তাকে মাসীর সঙ্গে। এসেছিল অনিচ্ছার সঙ্গে কিন্তু এখানে এসে তার ভাল লেগেছিল রূপীকে। রূপীর বয়স তখন বারো তেরো। ওর স্বভাবে একটি আশ্চর্য মিষ্টতা আছে যেটি বোধ হয় জন্মগত।

সে প্রথমেই তাকে প্রশ্ন করেছিল—তুমিই তো দিদি ? আমার থেকে বয়সে তো বড় তুমি ?

সে জবাব দেয় নি। কি জবাব দেবে ? এবং জবাব দেবার মত মনও ছিল না। উত্তর দিয়েছিল চাঁপা মাসী। কথাটা তার কানে গিয়েছিল—বলেছিল—হ্যাঁ, পেনাম কর।

রূপী বলেছিল—এস না তার থেকে হ্যাণ্ডশেক করি। পায়ে হাত দিয়ে পেনাম—এই তো এতটুকু বড় তুমি ! বলেই হাতটা ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলেছিল—গুড মরনিং !

একটু ম্লান হেসেছিল সে।

চাঁপা মাসী ঘুরে এসে ঘরে ঢুকে বলেছিল—ওকে মেলা বকাসনে।

ওকে জিরুতে দে। কই দীপা কই? বলেই ডেকেছিল গলা তুলে—দীপা—।

ও ঘর বা কোনখান থেকে দীপা উত্তর দিলে—আমি চুল আঁচড়াচ্ছি।

মা অর্থাৎ চাঁপা মাসী বলেছিল—মরণ হারামজাদীর। জাত-স্বভাব যাবে কোথা? চুল আঁচড়াচ্ছি! দিদি এসেছে—আয়।

—বাঃ। এই ছিরি করে যায় নাকি!

চাঁপা মাসী অবশ্য দাঁড়ায় নি, সে তখন অত্যন্ত ব্যস্ত—ক'দিন বাড়ি ছিল না, ঘরদোর গুছিয়ে ঘুরছে এ ঘর থেকে ও ঘর। সে দীপার উত্তরের আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল।

রূপী হেসে বলেছিল—এইবার মা গাল দেবে। খানকীর বেটী কসবী। দীপাটা দিনরাত সাজছে আর নাচছে। এই নাচছে—এই নাচছে। পাড়ায় নটীর পূজা দেখেছে তাই নকল করছে!

দীপা ঘরে ঢুকেছিল সেই মুহূর্ত্তটিতেই। রূপীর কথাগুলি শুনেছিল, বলেছিল—আর তুই? তুইও তো দিনরাত গান গাইছিস—সূরিয়া অস্ত হো গেয়া—সূরিয়া মস্ত হো গেয়া—গগন মস্ত হো গেয়া! আল্লা পানি দে—ম্যাঘ দে আল্লা—। থিয়েটার করছিস! এ্যাঃ—ওরে বাবা! মদ খাব না—সিগারেট খাব না—তা হলে কি খেয়ে বাঁচব নুটুদা! জান—একটা প্লে হচ্ছে—তুই পুরুষ—তাই দেখে এসে দিনরাত সুশোভনের আর গোপী মিত্তিরের পার্ট করছে। চা যেমন ডাল ভাত নয় তেমনি বিবেচনা করুন বিষও না; আপনি মুনিব, বলছেন খেতে—তা দাও হে এককাপ চা দাও! দিনরাত ফাঁক পেলেই করছে। আবার আমাকে বলছে।

মুক্তো শোকাচ্ছন্নতার থেকেও অসহায় অবস্থার উদ্বেগে বেশী অভিভূত হয়েছিল। দীর্ঘ রোগ ভোগে মা তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়েছে, তাতে তাকে প্রস্তুতই শুধু করে নি, ক্লান্তও করেছিল—

তার উপর এই পরিচয়ের আঘাত! এতেই তাকে অভিভূত করেছিল বেশী। এদের মত সত্য পরিচয়ের মধ্যে মানুষ হলে এমন হত না। এই সব কথাবার্তা শুনে তার মন চীৎকার করে উঠতে চেয়েছিল—

আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে ছেড়ে দাও। আমি চলে যাব। তাও তো কিন্তু পারে না মানুষ। বিশেষ করে সে তখন চৌদ্দ বছরের কিশোরী। ছেলে হলে সে হয়তো পারত। কিন্তু সে যে মেয়ে। এ দেশের মেয়ে। যেখানে মেয়েদের বিশেষণ অবলা। বলহীনা। যারা বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের দ্বারা রক্ষণীয়া।

দুই

চাঁপা মাসী স্নুরেন মেসো কিন্তু জীবনের ঘরে কোন জানালাতে ঘষা কাচ বা রঙীন কাচ লাগায় নি। পরিষ্কার সাদা কাচের কারবার। জীবনের বর্তমানেও বাইরের সাদা আলো রঙীন হয়ে পড়ে নি—এবং ভিতর থেকে বাইরেটা অর্থাৎ ভবিষ্যৎটাও রঙীন হয়ে দেখা যেত না। সবটাই খোলাখুলি স্পষ্ট। কয়লার ডিপো থেকে চলত ওদের মন্দ নয়, ভালোই। যুদ্ধের বাজারে তো কয়লা থেকে বেশ কামিয়েছে। ছেলে পড়ে মেয়েও পড়ে। তা বলে ছেলে প'ড়ে একটা কেষ্টবিষ্টু হবে তা তাদের কল্পনা ছিল না, যা হয় হবে, কয়লার ডিপোটা তো আছেই ; তবে মেয়ের সম্পর্কে উচ্চাশা কালের সঙ্গে ফুলে ফলে ভরে উঠছিল।

সিনেমা আর্টিস্ট হবে দীপা।

১৯৪২।৪৩ সাল।

বাংলা দেশে কলকাতার ভাল ভাল ঘরের মেয়েরা ছবিতে নামছে; সিনেমায় নেমে চাঁপা মাসীর জানাশোনা ও চেনা মেয়েরা যখন আর্টিস্ট হয়ে খ্যাতি ও অর্থ ই শুধু নয় কত সদ্বংশের বউ হয়ে যাচ্ছে তখন এর চেয়ে ভাল ভবিষ্যৎ মেয়ের জন্যে আর কি হতে পারে ?

স্নুরেন মেসো খবরের কাগজ নিত, পড়ত ; তার মধ্যে শুক্রবারের কাগজের দাম বেশী। ওই দিন কাগজে থাকে সিনেমার খবর, থিয়েটারের খবর। চাঁপা মাসী ছেলেকে পাঠায় মাসে মাসে সিনেমার কাগজ কিনবার জন্য। ছেলে মেয়ে চাঁপা মাসী স্নুরেন মেসো সেগুলি কণ্ঠস্থ করে নিত। যুদ্ধের কাল, দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন চলছিল—দেশে অভাব মড়ক—এ সব নিয়ে তাদের মাথাব্যথা ছিল না, তবে

কথাবার্তা তাদের হত; কিন্তু জীবনের সব আগ্রহ ছিল সিনেমা নিয়ে। এরই মধ্যে তার জীবন শুরু হল নূতন করে।

তার জীবনের মূলে রয়েছে একটা গোপন করে রাখা ছি-ছিকার। এটা যদি তার মা তার কাছে জন্ম অবধি গোপন না করত, একটা ভগবানকে বিশ্বাস আর ভক্তির ভানের নামাবলী পরিয়ে হিতোপদেশের নীলবর্ণ শৃগালের শৃগালত্বের উপর একটা অবজ্ঞা ঘৃণা না জন্মিয়ে দিত তা হলে এই ছি-ছিকার বোধ থেকে পীড়া সে অনুভব করত না।

মাসখানেক পর দীপাদের স্কুলেই তাকে ভরতি করে দিয়েছিল সুরেন মেসো। তখনও সে মুক্তমালা বোস। বাবার নাম ভূদেব বোস। কিন্তু দীপা তার মায়ের নাম আর সংগীতখ্যাতির গৌরব প্রকাশ করে দিয়েছিল সগৌরবে। তার মায়ের গানের রেকর্ডের কথাটা অহংকার করেই সে বলে বেড়িয়েছিল।

—জান, মুক্তোদি'র মা, আমার মাসী খুব ভাল গান গাইত। রেকর্ড আছে। খুব ভাল রেকর্ড। কেত্তনগান। সজনী কি হেরিনু যমুনার কূলে! ব্রজকুলনন্দন, হরিল আমার মন—ত্রিভঙ্গ দাঁড়ায়ে তরুমূলে। আর এক পিঠে আছে গজল—রুয়েঙ্গে হম হাজারো বার মুঝে কোই মানা না কিয়ো!

মুক্তামালার শরীর যেন ঝিমঝিম করে উঠত। তার মনে হত—এখনি, যাদের কাছে গৌরব করে দীপা এই সংবাদটি দিচ্ছে তাদের মুখে সেই বিচিত্র হাসি ফুটে উঠবে—যা ফুটে উঠেছিল বর্ধমানের শ্মশানে—সেখানকার লোকেদের মুখে।

তার জন্মের বছরেই—মাস আষ্টেক পর—তার জন্মদাতা রুগ্ন-দেহেই তদ্বির করে গ্রামোফোন কোম্পানীর কর্তাদের ধরে পেড়ে মায়ের এই গান দুখানা রেকর্ড করিয়েছিলেন। আশা করেছিলেন—যদি গান দুখানা বাজারে জনপ্রিয় হয় তবে এই দিক থেকে কাঞ্চনমালার জীবনের উপার্জনের পথ খুলবে। নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

সে আশা পূর্ণ হয় নি, শুধু এই রেকর্ডখানায় প্রমাণ থেকে গেছে—কাঞ্চনমালা দাসী ছিল পেশাদার কীর্তনওয়ালী। ঢপ কার্তনওয়ালী।

দীপাকে সে বারণ করত—ওসব কথা কেন বল দীপা ?

দীপা বলত—কেন, বলব না কেন ? হিংসুটিরা সব শুনুক না! আমার মা থিয়েটার করত, আমি তো সবাইকে বলি !

চুপ করতে হত তাকে।

যাদের কাছে দীপা এ গল্প করত তারা অনেকে প্রশ্ন করত—তুমি গান গাইতে পার ?

সে বলত—না।

দীপা বলত—না—না। খুব ভাল পারে। গায় না। আমি শুনেছি—একা যখন থাকে, তখন গুনগুন করে গায়! রেডিয়োতে গান হয়—যে গান ভাল লাগে সেটা, একা থাকলে নিজে গায়। রবীন্দ্রসংগীতে ভারী ঝোঁক !

সে যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত কাঠের পুতুলের মত চলে যেত সেখান থেকে। কিন্তু চলে গিয়ে এমন ক্ষেত্রে রেহাই পাওয়া যায় না। হয় তো সব দেশে সব সমাজে এর কিছু কিছু আছে—কিন্তু এ দেশে এ সমাজে এর আর ক্ষমা নেই। এ দেশে মানুষকে ছুঁলে মানুষ স্নান করে, নিজের বিছানাও এখানে পবিত্র নয়, অন্ন জল এ দেশে মানুষের স্পর্শে অপবিত্র হয়। সেই দেশে কি কাঠের পুতুল হলেও রেহাই পায় কেউ ? সেও পায় নি। একদিন কাঠের পুতুলত্বের ভিতর থেকে তার অন্তরাত্মা চিৎকার করে উঠল।

অহল্যা অসতীত্বের অপরাধে পাথর হয়ে গিয়েছিল। সে গল্প সে শুনেছে। পড়েছে। আজ এই চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়সের মন তার নূতন ব্যাখ্যা আবিষ্কার করেছে। মানুষের দেহ সত্যিই পাথর হয় না; মন পাথর হয়। সে যেমন ইস্কুলে কাঠের পুতুল হয়েছিল—তেমনি

গৌতম ঋষির পরিত্যক্ত স্ত্রী অন্তরে পাথর হয়ে ঘুরে বেড়াত, গ্রাহ্য করেনি মানুষের ব্যঙ্গ, গ্রাহ্য করেনি সমাজের শাস্তি; সে অরণ্যে অরণ্যে বনবাসিনী হয়ে ফিরত, স্তব্ধ বোবা হয়ে থাকত। মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে নি। তারপর রাম এসে তাকে পদাঘাত যে দিন করলেন—সেই দিন পাথরের মন ফেটে গেল মর্মান্তিক বেদনায়। ভেঙে পড়ল। কাঁদল রামের পায়ে ধরে। রাজার ছেলে রাম, লোকে তাঁকে বলত ভগবানের অবতার, তাঁর আদেশে দেশের সমাজের একপ্রান্তে সে স্থান পেয়েছিল। সে অহল্যার মত নয়, তবু তার সঙ্গে নিজের একটা মিল খুঁজে বের করে। অহল্যার দোষ—অহল্যার; সে দোষ কতটুকু তার বিচার থাক, হয় তো ষোল আনা অপরাধের এক আনা। তার ক্ষেত্রে অপরাধ তার নিজের এক পাইও নয়। অপরাধ জন্মদাতার, অপরাধ গর্ভধারিণীর। যার জন্যে সে কাঠের পুতুল হয়েছিল। তারপর একদিন সে কাঠের পুতুল ক্ষোভে অপমানে অন্তরের আগুনে জ্বলে উঠল। তার ভাগ্যে রাজার ছেলে রাম নয়, বর্ধমানেরই এক উকিলের নাতনী তাকে লাথি মারার মতই আঘাত করলে।

মাস আস্টেক পর।

১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাস।

সেবার সে ক্লাস প্রমোশন পায় নি, ফেল করেছিল। দীপাও পায়নি। রূপী কেঁদেকেটে উঠেছিল। চাঁপা মাসীর বাড়িতে তা নিয়ে কোন ক্ষোভ হয় নি। চাঁপা মাসী একটু ক্ষুব্ধ যদিবা হয়েছিল কিন্তু সুরেন মেসোর পরিহাসে তা জোরালো ফুৎকারে আগুনের ফিন্‌কির মত নিভে গিয়েছিল।

চাঁপা মাসী বলেছিল—একটা কেউ বাড়ির প্রমোশন পেলে না গা! (তখনও কাঁদাকাটা করে রূপীর প্রমোশন হয় নি।) তা হলে—অপব্যয়গুলো করে হবে কি?

সুরেন মেসো বলেছিল—যেত্‌দাও (যেতে দাও) মহিন্দর—যেত্‌দাও। বেশী বকো না! (বোধ হয় কোন পুরানো নাটকের কথা)।

চাঁপা মাসী বলেছিল—যেত্‌ দোবো! বক্‌বো না?

সুরেন মেসো গড়গড়ায় কাঠের নল লাগিয়ে তামাক খেতো, আর খেতো এক ডেলা আফিং। চোখ প্রায় বুঁজেই থাকত। সেই অবস্থায় তামাক খেতে খেতেই বলেছিল—হ্যাঁ। যেত্‌ দেবে। বকবে না।

—কেন?

—আরে! গড়গড়ার নল থেকে এবার মুখ তুলে—চোখের পাতা দুটোকে চেষ্টা করে চাড় দিয়ে খুলে আরক্ত দৃষ্টিতে সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়েছিল। তারপর বলেছিল—আরে আমার ছেলেমেয়ের লেখাপড়া হয়? ইস্কুলে ফিফ্‌থ ক্লাস থেকে ভেগেছিলাম। এক ক্লাসে তিন বছর ছিলাম। ভেবেছিলাম কেঁদেকেটে প্রমোশন পাব, তা হেডমাস্টার বললেন—তোকে প্রমোশন দিতে হলে গরুকে দিতে হবে। ও কেষ্ট, কেরানীবাবুকে বল তো সুরেনের বাংলা খাতাটা দিতে। খাতা এল—মাস্টার দেখালেন—গরু বানান লিখেছি গ রয়ে উ। তারপর বললেন—তোর পকেট থেকে হেডপণ্ডিত পরীক্ষার হলে সিগারেট বের করেছিলেন, তাতে কি ছিল? সিগারেট? তাঁর মাথা ঘুরেছে! ছিল চরস। মিকচার টোবাকোর সঙ্গে চরস মিশিয়ে খেতাম। বুয়েচ! এরপর পড়া ছাড়লাম। তারপর অ্যামেচার থিয়েটার। শেষ পর্যন্ত পাবলিক থিয়েটারে ড্যান্সিং মাস্টার। একবার এস্টারের বড়বাবু নাটক কপি করতে দিয়েছিলেন—এমন কপি হল যে সে পড়ে কোন্‌ বেটা। তা আমার ছেলেমেয়ের লেখাপড়া কি করে হবে বলো? আক্ষেপ করো না চম্পকরানী, বৃথা এ আক্ষেপ তব, অরণ্যে রোদন।

চাঁপা মাসী বুঝেছিল। কিন্তু পড়া ছাড়ায় নি ছেলেমেয়ের। সিনেমাতে ঢুকতে হলে লেখাপড়া চাই। অন্ততঃ ম্যাট্রিক ফেল এটা বলতে পারা চাই। তার সম্বন্ধে কথা ওঠেনি। মায়ের মৃত্যুর পর মাত্র কয়েক মাস সে ভরতি হয়েছিল। আর টাকা যেটা তার পিছনে খরচ হচ্ছিল সেটা তার বাড়ি বিক্রির টাকা। বিশ বছর আগে আড়াই হাজারে কেনা বাড়ি সাত হাজারে বিক্রি হয়েছে। সে নিজে ক্ষুব্ধ হয়েছিল। দুঃখ পেয়েছিল কিন্তু পরিশ্রম সে কম করে নি, তাই অনুশোচনা বা নিজেকে তিরস্কার করতে পারে নি—শুধু দুঃখ পেয়েছিল, কেঁদেছিল।

ক্লাসে নিচের ক্লাসের মেয়েরা উঠে এল। সঙ্গে এল এই মেয়েটি—নাম গায়ত্রী মুখার্জী। বর্ধমানের কোন উকিলের পৌত্রী—বাপ কোন্ তেল কোম্পানীতে কাজ করে, আগে থাকত ভবানীপুরে, এখন নতুন কলোনীতে বাড়ি করে এখানে থাকে। মেয়েটি এ স্কুলে এসেছে অল্প কিছুদিন। প্রমোশনের দিন সে তাদের ক্লাসের মেয়েদের নাম ডাকা শেষ হলেই চলে এসেছিল, তার নাম তাদের মধ্যে ছিল না। তারপর দু তিন দিন কেঁদেছিল। তারপর কয়েকদিন ইস্কুল আসে নি। তারপর এল ইস্কুল। যে দিন এল সেই দিনই একটি ঘটনা ঘটল। সে ক্লাসে ঢুকে ভাবছিল কোথায় বসবে। একটা বেঞ্চে আরও দুজন ফেল করা মেয়ে বসেছিল। তারাই তাকে ডেকেছিল—মুক্তো এখানে আয়। এই বেঞ্চে।

মুক্তা সেই বেঞ্চেই গিয়ে বসেছিল। গায়ত্রী উঠে গিয়েছিল বেঞ্চখানা থেকে। কারণটা সে দিন বুঝতে পারে নি মুক্তা।

কয়েকদিন পর গায়ত্রী এসে হঠাৎ তাকে বললে—আমাদেরও বাড়ি বর্ধমান।

মুক্তার বুকখানা ধড়াস করে উঠল। সে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

গায়ত্রী হেসে বললে—আমার মা তোমার মাকে দেখেছে। বলছিল—তোমার মা খুব ভাল গান গাইত।

সে হাসির মধ্যে ইঙ্গিত ছিল। মুক্তার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল হাত পা ঘামতে শুরু করেছিল। চুপচাপই সে থাকত। অভ্যাসে অভ্যাসে যেন স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। বুকের ভিতর বিদ্রোহ জেগেছিল কিন্তু বলতে কিছু চায় নি—পারে নি। এর উত্তর যে সে আজও খুঁজে পায় নি। এর উত্তর সে মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—মা উত্তর একটা দিয়েছিল—সে উত্তর উত্তর নয়—সে তার মায়ের কৈফিয়ৎ। যে কৈফিয়তে সে নিজেই সন্তুষ্ট হয় নি—দুনিয়া তাতে খুশী হবে কেন? মায়ের মত সে যদি বলতে পারত তবে ভাল হত। কিন্তু সে তা আজও পারলে না। সে দিন পারার কথাই ছিল না। সে শুধু স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে সেই তাকিয়েই ছিল।

গায়ত্রীর বয়স হয়েছিল। তার থেকে তার বেশী বয়স। তা ছাড়া সে সেই ধরনের মেয়ে যারা বয়সের চেয়ে অনেক বেশী বয়সের মেয়ে হয়ে ওঠে। যাদের বাড়িতে পুরনো আমলের সেই রেওয়াজ আজও আছে যাতে মেয়েরা যুবতী হতে হতে বুড়ির মত কথা বলতে পারে। সে মুখ মচকে বলেছিল—তুমি বোবা নাকি?

সে এবার বলেছিল—না। বোবা কেন হব?

—তবে? কথা বল না যে?

—এই তো বলছি।

—কিন্তু সবাই বলে, তুমি কথা বল না।

এ কথারও সে জবাব দেয় নি। আবার সে চুপ করে গিয়েছিল।

—আচ্ছা, চলি।

বলে গায়ত্রী চলে গিয়েছিল। ক্লাসে মাস্টার তখনও আসে নি। শুরু হয় নি স্কুল। যাবার সময় গায়ত্রী গান গেয়েছিল গুনগুন করে।

—গোকুল নগর মাঝে আরও কত নারী আছে

তাহে কেন না পড়ল বাধা।—কীর্তন গেয়েছেন কাঞ্চনমালা দাসী।

সারাটা দিন সে কাঠ হয়ে বসেছিল। না কাঠ নয় –ছিল কাঠ, সেদিন সে পাথর হয়ে গিয়েছিল। কাঠ মাটির তলায় চাপা পড়ে পাথর হয়। সে দিন এ কথা সে জানত না—আজ সে লেখাপড়া না শিখেও অর্থাৎ ইস্কুল কলেজে না পড়েও অনেক শিখেছে, অনেক জেনেছে, আজ সে জেনেছে। শুধু পাথর কেন কয়লাও হয়—আগুন লাগে কয়লায়।

ইস্কুলে যে পড়া তার হয় নি, পড়েও যে সে ভাল করে কিছুই বুঝতে পারত না তার কারণও এই। একটা আশঙ্কায়, নিজের প্রতি একটা বিতৃষ্ণায় তার মন প্রথমে কাঠ, পরে পাথর হয়ে গিয়েছিল।

চাপা হাসির একটা তরঙ্গ ক্লাসের অন্য প্রান্তে বয়ে যাচ্ছিল কিন্তু তার আভাস এই প্রান্তে তার কাছে অগোচর থাকে নি। শুধু চাপা হাসিই নয়– মধ্যে মধ্যে সপ্রশ্ন বিস্মিত দৃষ্টি গায়ত্রীর মুখের দিকে প্রথম নিবদ্ধ হয়ে মুহূর্ত পরে তার দিকে ফিরছিল।

টিফিনের সময় স্রোতটা এসে সরাসরি তার উপর আছড়ে পড়েছিল। ওপাশের একটি মেয়ে এসে তাকে প্রশ্ন করেছিল—তোমার মা নাকি ঢপ-কেত্তনওয়ালী ছিল? সে কি উত্তর দেবে? বিস্ফারিত নিষ্পলক দৃষ্টিতে সে তার দিকে শুধু তাকিয়েই ছিল। গায়ত্রী পিছন থেকে এসে বলেছিল—উত্তর দাও না কেন?

তার কণ্ঠ থেকে এবার স্বর বের হয়েছিল। তাতে অসহনীয় উত্তাপ। সে উদ্ধতভাবে উত্তপ্ত কণ্ঠে বলেছিল—হ্যাঁ ছিল।

—তোমার মা বেশ্যা ছিল?

এবার বিস্ফোরণ হয়েছিল। তার দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না। সে বাঘিনীর মত লাফ দিয়ে পড়েছিল গায়ত্রীর উপর। এবং চিৎকার করেছিল—না—না—না। অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন—হেডমিস্ট্রেস। —কি হল? কি হয়েছে? ছাড়! ছাড়!

ছেড়ে দিতে হয়েছিল। কিন্তু ঘটনা তো এখানেই শেষ হবার নয়! অফিস রুমে ডাক পড়েছিল। দুজনেরই ডাক পড়েছিল। হেডমিস্ট্রেস দুজনকেই ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি হয়েছিল বল!

ঠিক এই সময়ে অন্য একজন দিদিমণি হেডমিস্ট্রেসের কানে কানে কিছু—কি আর কিছু,—এই ঘটনার কথাই সংক্ষেপে তাঁকে বলেছিলেন,—নইলে হেডমিস্ট্রেস বলবেন কেন—তুমি একটু বাইরে যাও—ওই টিচারদের রুমে গিয়ে বস। পরে ডাকব তোমাকে।

টিচারদের ঘরে গিয়ে এক পাশে সে চুপ করে বসেছিল। অন্তরে কিন্তু আগুন জ্বলছিল। মনে হচ্ছিল উদ্ধত চীৎকারে সে বলে—হ্যাঁ—আমার মা—। আজও স্পষ্ট মনে পড়ছে—এইখানেই তার মনের কণ্ঠও যেন আপনাআপনি রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল—নিজের ভিতরেই কেউ যেন মনের কণ্ঠকে সজোরে টিপে ধরে বলছিল—না—। সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভিতর থেকে অসহনীয় বেদনার ক্ষোভের সমুদ্র কলকল্লোলে আছড়ে পড়তে চাচ্ছিল বাইরে এসে। চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু সেই হাতখানাই এবার তার মনের মুখের উপর চাপা দিয়ে সেই ভিতরের জন বলছিল—ছি! মেঝের দিকে চেয়ে সে বসেছিল কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করছিল—টিচারদের বক্রকটাক্ষ একবার তার দিকে একবার নিজেদের মধ্যে মুহূর্তে মুহূর্তে বিনিময় হচ্ছিল—ইঙ্গিত চলছিল। অনেকজনের ঠোঁট দুটি ওই গায়ত্রীর মতই উল্টে উল্টে যাচ্ছিল।

অসহনীয় শীতে যেমন কষ্ট হয় ঠিক তাই যেন হচ্ছিল তার। সূচিতীক্ষ্ণ কিছু যেন তাকে বিঁধছিল, দেহ হয়ে আসছিল অসাড়।

এ অনুভূতি স্পষ্ট মনে আছে আজও। মনই অসাড় হয়ে আসছিল আসলে। কিছুক্ষণ পর যখন তার ডাক পড়েছিল তখন প্রথমটায় সে ঠিক খেয়াল করতে পারে নি। তাকে গায়ে হাত দিয়ে ডাকতে হয়েছিল, চমকে উঠেছিল সে ; যে দিদিমণি কাছে বসেছিলেন তিনি তার গায়ে হাত দিয়ে ডেকেছিলেন,—তোমাকে ডাকছেন। শুনতে পাচ্ছ না ?

সে আস্তে আস্তে উঠে এসে আপিস ঘরে টেবিল ধরে দাঁড়িয়েছিল। হেডমিস্ট্রেস বলেছিলেন—কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করব তোমাকে। সত্যি জবাব দেবে! কেমন ?

সে ঘাড় নেড়ে বলেছিল—হ্যাঁ।

—তোমার—। কথা বলতে তাঁরও বাধছিল। একবার থেমে দ্বিতীয়বারে শেষ করে বলেছিলেন—তোমার মা কীর্তন গাইতেন ?

—হ্যাঁ।

—কাঞ্চনমালা—কীর্তনগায়িকা ?

—হ্যাঁ।

—বর্ধমানে থাকতেন ?

—হ্যাঁ।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি তো বর্ধমান ইস্কুলের সার্টিফিকেট নিয়ে এসে ভরতি হয়েছ। মিশনারী ইস্কুল!

এর উত্তর আর সে দেয়নি। গলা তার শুকিয়ে আসছিল।

হেডমিস্ট্রেসও কিছুক্ষণ চুপ করেছিলেন। এর পর আর যেন প্রশ্ন পাচ্ছিলেন না তিনি। হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—বোধ হয় খুঁজে পেলেন—কাঞ্চনমালা দাসী ? না ?

সে ঘাড় নাড়লে—হ্যাঁ।

—জাতে কি তোমরা ?

—বোষ্টুম !

—কিন্তু—তোমার নাম রয়েছে মুক্তামালা বোস। বাবার নাম রয়েছে ভূদেব বোস। কেন বল তো ? মা দাসী ! বাবা বোস !

অকস্মাৎ সব কালো হয়ে গিয়েছিল—অথবা কালো একটা সমুদ্রের মত কিছু এসে দিনের আলো বাইরের সব—অফিস রুম—সব সব ঢেকে ফেলেছিল বা ডুবিয়ে দিয়েছিল।

আর তারপর কিছু মনে নেই।

কতক্ষণ পর সে জানে না, আবার দিনের আলোর মধ্যে ফিরে এসেছিল। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল সে। সে শুয়েছিল একখানা বেঞ্চের উপর। একজন দিদিমণি মুখে জল দিচ্ছিলেন, স্কুলের ঝি মাথায় হাওয়া করছিল।

কথা আর কিছু হয় নি। কিছুক্ষণ পরে একখানা রিক্‌শা ডেকে একজন দিদিমণি তাকে সঙ্গে করে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং দিয়ে গিয়েছিলেন ইস্কুলের একখানা পত্র। তার গার্জেন মেসোমশায়কে যেতে লিখেছিলেন হেডমিস্ট্রেস।

অকস্মাৎ চাঁপা মাসীর গৃহস্থঘরের সব আবরণ নিতান্তই একটা খোলসের মত খসে পড়েছিল। কুৎসিত ভাষায় উলঙ্গ অশ্লীল গালি-গালাজ শুরু করেছিল মাসী ওই গায়ত্রীকে এবং ইস্কুলের দিদিমণিদের। সে শুয়েছিল, শুয়ে শুয়েই শুনছিল, তারপর সে এখানেও যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল। তার মাও কি এমনি আঘাতে এমনি উলঙ্গ গালি-গালাজ করতে পারত ? সেও কি পারে ? আজ না-পারলেও কাল পারবে ?

ব্যাপারটা আরও খানিকটা গড়িয়েছিল। সুরেন মেসোকে ডেকে হেডমিস্ট্রেস বলেছিলেন, ভালকরেই বলেছিলেন—দেখুন এ নিয়ে

যখন আন্দোলন হয়েছে তখন তো মুক্তাকে বা দীপাকে আর রাখতে পারব না! ইস্কুলের ক্ষতি হবে।

সুরেন মেসো আহত হয়েছিলেন। বলেছিলেন—ওদের মা বাপের যাই দোষ থাক ওদের দোষ কি বলুন?

—সে বিচার আমি করব না সুরেনবাবু, আমাকে ইস্কুল রাখতে হবে। ইস্কুলের জন্য ওদের আমি রাখতে পারব না। আপনি অন্য ইস্কুলে দিন না।

—না। সেখানেও যদি এই বলে?

—কি করব? আমি নিরুপায়। আমাকে নোটিশ দিয়ে নাম কেটে দিতে হবে।

সুরেন মেসো একটু অনুনয় করেছিলেন, বলেছিলেন—আপনি জানেন না, মুক্তার মা বলতে গেলে মুক্তার জন্মের আগে থেকে গৃহস্থঘরের মেয়েদের থেকেও ভাল ছিলেন। একটু ক্ষমা ঘেন্না করে না-নিলে—

—উপায় নেই। কি করব আমি। ইস্কুল আমার ভেঙে যাবে।

এবার চটেছিলেন সুরেন মেসো। বলেছিলেন—ভাল, মুক্তোকে বলছেন—সে আসবে না। কিন্তু দীপা আসবে। তাকে আপনি তাড়ান কি করে তা আমি দেখব।

চলে এসেছিলেন সুরেন মেসো। তারপর ইস্কুল থেকে নোটিশ এসেছিল—পরিচয় গোপন করে মুক্তা ও দীপাকে ভরতি করা হয়েছে। তাদের সঙ্গে পড়তে স্কুলের মেয়েদের সামাজিক কারণে আপত্তি আছে। সুতরাং তাদের নাম কেটে দেওয়া হল।

সুরেন মেসো দিয়েছিলেন উকিলের নোটিশ। তার ব্যাপার নিয়ে নয়, দীপার ব্যাপার নিয়ে।

সুরেন মেসো চাঁপা মাসীকে থিয়েটারের লোকদের সাক্ষী রেখে—

চাঁপা মাসীদের সমাজের পুরোহিত ডেকে অনুষ্ঠান করেই বিয়ে শেষ করেন নি ; রেজেস্ট্রী করেও বিয়ে করেছিলেন।

ওই সমারোহের কিছুদিন পর। লোকের ব্যঙ্গে ঠাট্টায় ক্রুদ্ধ হয়ে করেছিলেন রেজেস্ট্রী বিয়ে। থিয়েটারের লোকে বলেছিল—মিত্তিরের মরণ, চাঁপারও আদিখ্যেতা। বিয়ে! দূর। দুদিন পরে মিত্তির ছুটবে চাঁপাকে ছেড়ে পারুলের বাড়ি— চাঁপা ধরবে নতুন কাপ্তেন। সঙ করবি তার এত ঢঙ কেন ?

শুধু পুরুষরাই নয়। মেয়েরাও। মেয়েরা মুখে কাপড় দিয়ে হাসত। একজন সেই বৈশাখে চাঁপাকে ঠাট্টা করে বলেছিল—তোকে ভাই এবার এয়ো করব আমি। চাঁপা মাসী তাকে কি জবাব দিয়েছিল সেটা কাহিনী এবং স্মৃতি থেকে মুছে গেছে, সুরেন মোসোরও গেছে, চাঁপা মাসীরও গেছে— তবে তাদের সে মর্মবেদনার কথা মনে আছে ; বেদনা তারা দুজনেই পেয়েছিল, এই ক্ষেত্রটিতে তাদের দুজনেরই মনের চামড়ার অবস্থা গণ্ডারের চামড়ার মত পুরুই ছিল কিন্তু তা তখন বিচিত্রভাবে কোমল মানুষের চামড়া হয়ে উঠেছিল— তারা এতে আঘাত পেয়েছিল। এবং দুজনেই পরামর্শ করে রেজেস্ট্রী করে এসেছিল।

সার্টিফিকেটখানা ছিল। কোন দিন কাজে লাগবে বলে ছিল না, পরম প্রিয় বস্তু বলে ছিল। তারই নকল সমেত গিয়েছিল উকীলের চিঠি এবং মানহানির জন্য নালিশের কথাও তাতে লেখা ছিল। এরপর হেডমিস্ট্রেস সেক্রেটারী ছুটে এসেছিলেন চাঁপা মাসির বাড়ি। ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন—যা হয়ে গেছে গেছে, দীপাকে পাঠিয়ে দেবেন। মুক্তাকেও দেবেন। তবে—গোলমাল তো ওকে নিয়েই কিনা। একটু ভেবে দেখুন—ইস্কুলটা হয় তো ভেঙে যাবে।

সুরেন মেসো টেবিলে চাপড় মেরে বলেছিলেন—স্যর, আমি দু কান কাটা। এক-কান-কাটারা গাঁয়ের বাইরে বাইরে যায় দু কান-

কাটারা শহরের পথের উপর বুক ফুলিয়ে হাঁটে। ওই গায়ত্রী না কি, ওর বাবাটার খোঁজ আমি নিয়েছি স্যর। ওটার আবার নাক কান দুই কাটা। মুক্তোর মা কাঞ্চন এই পাপ জীবন থেকে পালাতে গিয়ে আসানসোলে কয়েকটা ডাকাত লোচ্চার হাতে পড়েছিল—তারা তার লাঞ্ছনার বাকি রাখে নি। খবরের কাগজে শোরগোল উঠেছিল—লিখেছিল—ভদ্রলোকে পুণ্য করে না পতিতে পুণ্য করে। সব ভদ্দর-লোকের ছেলে গুণ্ডা লোচ্চা তারা। মস্ত কেস। সেই কেসে ওই গুণ্ডাদের উকীল ছিল গায়ত্রীর ঠাকুরদা। ওর বাবাও গুণ্ডা। সেটা ছিল গুণ্ডাদের টাউট। মহাজন টুলিতে নামী লোক। তবে উকীলের বেটা চাকরি পেয়ে গেছে। এখন জেন্টেলম্যান। আমি ফাঁস করে দিচ্ছি। যেতে দিন বললে শুনছি না।

তাই বলতে তাঁদের হয়েছিল। কিন্তু সেটা এ পক্ষের জন্যেই তাঁরা বলেছিলেন। অর্থাৎ দীপা এবং মুক্তার জন্যে।

পরের দিন সুরেন মেসো নিজে পরমোৎসাহে সেজেগুজে ডাক দিয়েছিলেন—দীপা মুক্তো—হল তোদের, চল আমি নিয়ে যাব তোদের ইস্কুলে।

দীপার হয়েছিল—সে তৈরী হয়ে বলেছিল—যাচ্ছি বাবা। মুক্তোদির হয় নি।

মু—ক্তো! ডাক দিয়েছিলেন সুরেন মেসো।

মুক্তো চুপ করে বসেছিল তার বিছানার তক্তাপোশটার একটা কোণে। একটা দুরন্ত ভয় তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল; পাশে বই দপ্তর পড়েছিল কিন্তু কোন মতেই উঠে দাঁড়াতে পারছিল না সে।

তার মনের চোখের সামনে অসংখ্য মেয়ের ব্যঙ্গ-হাস্যে মেলা দাঁতগুলো যেন লম্বা ধারালো ছুরির মত সারি বেঁধে উঁচিয়ে ছিল—ঝিকঝিক করছিল—তাকে যেন টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে।

দীপা এসে দাঁড়িয়েছিল—এসো ওঠো। দীপার উৎসাহ সুরেন মেসোর মত। অথবা তার থেকেও বেশী। কিন্তু মুক্তো পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। দীপা তার বইয়ের ব্যাগটা তুলতেই সে চেপে ধরেছিল।

—না।

তারপর এসেছিল চাঁপা মাসী—মুক্তো।

সে বলেছিল—না।

চাঁপা মাসী তার হাত ধরে বলেছিল—না নয়, ওঠ! যেতে হবে তোকে।

সে কেঁদে ফেলেছিল—না—না। অন্য হাতটা দিয়ে বিছানার চৌকির বাজুটা চেপে ধরেছিল।

—কেন?

—না—না। আমি যাব না।

—মুক্তো, তোর হল কি? এবার এসেছিলেন সুরেন মেসো। সঙ্গে রূপী।

সে এবার সবেগে ঘাড় নেড়ে নিদারুণ আতঙ্কে কেঁদে উঠে বলেছিল—আমি যাব না। আমি মরে যাব। না—না—না। রাগ করে চাঁপা মাসী টেনেছিল তাকে সজোরে। সে-টানে তার হাত ছেড়ে গিয়ে সে আছড়ে পড়েছিল মেঝের উপর। পড়বার সময় চৌকির কোণে লেগে তার কপালটা কেটে রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু সে কথা সে জানতে পারে নি, সে অধিকতর আতঙ্কে চীৎকার করে কেঁদে উঠেছিল—তোমাদের পায়ে পড়ি, তোমাদের পায়ে পড়ি। আমি যাব না। আমি পড়ব না। চাঁপা মাসী ছেড়ে দিয়েছিল তাকে।

সুরেন মেসো বলেছিল—থাক তবে, আজ থাক ও। চল দীপা তুই চল।

তিন

এরপর আর সে ইস্কুলে যায় নি। চেষ্টা সুরেন মেসো করছিল —প্রায় এক মাস ধরে চেষ্টা করছিল—প্রতিদিন সে এসে ডাকত—চল কোন ভয় নেই চল।

সে খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে থাকত। চুপ করে। সেই কাঠের বা পাথরের মূর্তির মত।

শেষপর্যন্ত চাঁপা মাসী একদিন ক্ষিপ্ত হয়ে তার চুলের মুঠোয় ধরে টেনেছিল।—যেতেই হবে তোকে!

সে চীৎকার করে কেঁদেছিল—না—না।

বাঁচিয়েছিল সুরেন মেসো এসে।—ছেড়ে দাও। করছ কি?

চাঁপা মাসী বলেছিল—না। আজ ওরই একদিন কি আমারই একদিন!

--না--না। যেত দাও।

—যেত দেবো!

--হ্যাঁ। যেত দাও। না যায় যাবে না।

—যাবে না তো করবে কি? আমরা গেরস্ত এখন। সোনাগাছির ব্যবসা তো নয়!

—কি বিপদ! চেঁচিও না।

—চ্যাঁচাব না! আর তো সব ঢাকা আছে তাই চ্যাঁচাব না ওই ওর জন্যে।

সুরেন মেসো বলেছিল—রূপীর সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে দেব। রূপীর তো বিয়ে দিতে হবে।

—রূপীর সঙ্গে বিয়ে? মাসতুত ভাই বোন। ও বয়সে এক বছরের বড়।

—হলেই বা! আমাদের শাস্তরে তো পিণ্ডিদোষ নেই। আর একবছরের ছোটতে যাবে আসবে না কিছু। বেটাছেলে—হু হু করে বেড়ে যাবে।

হঠাৎ রূপী ঘরে ঢুকে বলেছিল—এক থাবড়া মারব তোমার মুখে। খবরদার তুমি ও কথা বলবে না আর। ও কথা শুনলে পাপ হয়।

সে শুধু কাঠের মূর্তির মত এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। এবার তার চোখ থেকে জল পড়তে শুরু করেছিল। গায়ত্রীর কথায় তার বুকে আগুন জ্বলেছিল, রূপীর কথায় এসেছিল চোখে জল।

স্থরেন মেসো বলেছিল—ওরে আমার মুনি-ঋষির ব্যাটা। মুখে আমার থাবড়া মারবি! ও কথা শুনলে পাপ হয়! যে কাল পড়েছে তাতে বামুন বম্বি ভদ্দর-লোকের ঘরে রেজেস্ট্রী করে এই বিয়ে কত হচ্ছে—আর তুই বেটা আমার গঙ্গাজলখেগো কুলীনের পুত্তুর মহা-কুলীন! বলে কিনা পাপ হয়। তোর মাকে বিয়ে করে আমার পাপ হয়েছে? পাপ?

চাঁপা মাসী ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল—তুমি হলে পরমহংস মহাপুরুষ! তোমার আবার পাপ হয়?

রূপী বলেছিল—পাপ হয়ে থাকে তোমার হয়েছে। সে তুমি জান! তার প্রায়শ্চিত্ত তুমি করবে। তা বলে আমরা কেন পাপ করব? না। এসব কথা বলবে না তুমি!

দীপা মুখে কাপড় দিয়ে হেসেছিল তার মায়ের মতই।

বিচিত্র মানুষ স্থরেন মেসো। ও-কথা আর কোন দিন বলে নি এবং এ নিয়ে কোন ক্ষোভই তার ছিল না।

কয়েক দিন পর রূপীকে বলেছিল—ওরে বেটা আমার কথাটাই তুই বুঝলি নে। তোর মাকে বিয়ে করে আমার পাপ তো হয়ই নি, পুণ্যি হয়েছে। বুঝলি! পাপ করেছিলাম আগে—সেটা খণ্ডেছে।

রূপী কথা বলে নি। বলেছিল—চাঁপা মাসী। বলেছিল—কিন্তু তুমি কি করে বললে মুক্তোর সঙ্গে রূপীর বিয়ের কথা?

—কি করে বললাম?

—হ্যাঁ? কি করে? কোন্ শাস্তরে লেখে!

—কোন শাস্তরে লেখে না?

—যে শাস্তরে লেখে সে শাস্তর আমরা ছেড়েছি—গেরস্ত হয়েছি।

—মুসলমান কৃশ্চানরা গেরস্ত নয়?

—মরণ মরণ! মুখে আগুন! আমরা তাই?

—বেশ, হয়ে যেত ওরা। আমাদের ঘাটও নেই ঘরও নেই। একটা গাছতলা হলেই হল।

—তুমি আর ও সব কথা বলবে না।

—বেশ বলব না।

কিন্তু কয়েকদিন পরেই সুরেন মেসো বলেছিল—দেখ—একটা কথা বলছিলাম। মুক্তোর জন্যে একটা ভাল পথ পেয়েছি।

—যাক, মুক্তোর জন্যে ভেবো না তুমি।

—আরে শোনই না ছাই। এটা ভাল কথা।

—তোমার ভাল কথারও মুখে ছাই।

—আরে বাপু দয়া করে শোন। হাত জোড় করছি। মাইরি বলছি—ভাল আইডিয়া।

—বল।

সুরেন মেসো তার আফিংয়ের নেশায় বুঁদ হয়ে তামাক টানতে টানতেই কথা বলছিল।—এই কাল হঠাৎ মনে হয়ে গেল। দেখা

হয়ে গেল সুবাসিনী—মানে মুন্ সুবাসিনীর প্রভাত চাটুজ্যের সঙ্গে। জিজ্ঞেস করলাম খবর। ভালই। ছেলেমেয়ের কথা শুনলাম। ছেলেটি খাসা বুয়েচ, বি এস-সি পর্যন্ত পড়েছে, ফেল করে জামসেদপুরের ওখানে একটা চাকরি পেয়েছে, সেখানেই থাকে। দিব্যি বিয়েও করেছে। অবিশ্যি এখানে আসে না। মেয়ে দুটি তো ছোট—একজন আঠারো, একজন ষোল—তা দুজনকেই নার্সিং শেখাচ্ছে। বললে—বুঝছ তো, বিপদ তো ওদের নিয়েই। বিয়েতে টাকা ঢালতে পারলে ভাবনা ছিল না। গরীব ঘরের ভাল ছেলে পাওয়া যেত। তা যখন নেই তখন অনেক ভেবে চিন্তে এই লাইনেই দিলাম। লাইনটা ভাল। ভাল কাজ সৎ কাজ। তা আমারও মনে হল তাই তো, এ লাইনে তো অনেক মেয়ে যায়। ওখানে তো কুলুজী বিচার নেই। কি বল? ওর মায়ের যে ধারা ইচ্ছে ছিল তাতে ওটা আমার ভাল মনে হচ্ছে। সিনেমা লাইনে ও পারবে না। মানে, দেখছি তো—ভারী আড়ষ্ট—চব্বিশ ঘণ্টাই ভাবছে—মুখে হাসি নেই—গলা ভাল—শুনবামাত্র গান শিখে নেবার ক্ষমতা আছে কিন্তু নেশা নেই। ও ওর হবে না। তা—নার্সিং শিখে নার্স হোক না। কি বল?

চাঁপা মাসী বলেছিল—এ তো খুব ভাল। খুব ভাল বলেছ তো!

পুলকের আতিশয্যে চোখদুটো চাড় দিয়ে খুলে সুরেন মেসো বলেছিল—হ্যাঁ-হ্যাঁ, দেখ তা হলে আমার মাথা আছে কিনা। তা হলে প্রভাত চাটুজ্যের কাছে গিয়ে হদিসগুলো নিয়ে আসব, কি বল?

মাসী বলেছিল—দাঁড়াও, সেই মন্সাঠাকরুণকে একবার জিজ্ঞেস করি। মায়ের আমার ধূপের ধূনোয় চোখ নিয়ে জল যে ঝরছেই—
—ঝরছেই!

পাশের ঘর থেকেই সব শুনেছিল মুক্তা। কান্নার বদলে তার মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল।

চাঁপা মাসী চোখ থেকে জল ঝরার কথাটা অতিরঞ্জন করে নি। মায়ের মৃত্যুর পর থেকে সে তার মা বাপের উপর ক্ষোভে ও অশুচি-বোধে বেদনায় কাঠ হয়ে গিয়েছিল কাঠের পুতুলের মত। তার উপর মানুষের ঘৃণায় সে কাঠ থেকে হল পাথর। তারপর পাথর ফেটে কোথা থেকে এল জলের ধারা। চোখের জলের উৎস যেন বাকি জীবনটার জন্যই সে সময় বিমুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

দোষ কার? আজও সে ভাবে। দোষ কার? তার? অর্থাৎ তার জন্মের? না—সে তা মানতে পারে না!

পূর্বজন্ম? মিথ্যা। জন্ম জন্মান্তর—পূর্বজন্ম—মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা। অলীক কল্পনা।

কোন দূর সুদূর অতীতকালে মানুষ অজ্ঞানতার অন্ধকারের মধ্যে সদ্য জ্ঞানবুদ্ধির একটি আলো—হয়তো তার উপমা প্রদীপের মত—জ্বেলে পিছনের দিকে অন্ধকারের মধ্যে যখন ভ্রূণের আকারেও মানুষ থাকে তখন, তারও পিছনে আছে হয়তো আর একটি জন্মান্তর; এবং এ জন্মে—বর্তমানের মধ্যে পথ চলেছে যখন ভবিষ্যতে অন্ধকারের মধ্যে, তখন আরও একটি জন্মান্তর প্রতীক্ষা করছে তার জন্য। হয়তো অনুমানের পিছনে শুধু জ্ঞানের আলোকের স্বল্পতাটুকুই সব নয়—তার সঙ্গে মিশে আছে জন্ম ও মৃত্যুর দুই প্রান্তে নাস্তির শূন্যলোকের ভয়াবহতা। সেই ভয়ে এই কল্পনার চেয়ে বড় সান্ত্বনা কি হতে পারে? জন্মের জন্য কোন দোষ কোন অপরাধ তার নেই! নেই! নেই!

তবে কার? মার বাবার?

তাই বা কি করে বলবে? না, বলতে পারবে না? তার মা বাবার ভালবাসাকে সে অস্বীকার করতে পারবে না! মায়ের ভালবাসাকে তো নয়ই। বাবার—? একটু থমকে দাঁড়াতে হয় এখানে। কেন—? রোগ শয্যায় মৃত্যুকে সম্মুখে রেখেও দেহের আবেদন মঞ্জুর করলে কেন? উত্তর তারও আছে। যে দেহের

আবেদন মৃত্যু-ভয় রোগযন্ত্রণাকেও বিস্মৃত করিয়ে দিতে পারে তার আবেদন কি অমঞ্জুর করবার হাত কারুর আছে? মঞ্জুরী অমঞ্জুরীর ঊর্ধ্বে সে। যখন সে আসে তখন দিনকে আচ্ছন্ন নিষ্প্রভ করে অন্ধকারের আসার মত অনিবার্য শক্তিতে সে আসে বা জাগে।

শুধু একটি প্রশ্ন। ঈশ্বরের নাম নিয়ে তোমরা তপস্যা করেছ—তোমরা মিথ্যা দিয়ে সত্যকে ঢেকে রেখেছিলে কেন? তার পরিচয় তারই কাছে বা কেন ঢেকে রেখেছিলে? মানুষ তার এই জন্মপরিচয়কে অশুচি ভাবে—সেটা সমাজের সংস্কার; তোমরা সত্য পরিচয় গোপন করে তার মধ্যেও সেই সংস্কার জন্মাতে দিলে কেন?

মা হয়তো এ পরিচয় গোপন করত না। প্রথম বাল্যেই সে নিশ্চয় জানতে পারত, এবং সেই সত্যকে স্বীকার করলে সে তো নিজেকে নিজে ঘৃণা করত না!

চাঁপা মাসীর ছেলে মেয়ে তারা তো নিজেদের নিজেরা ঘৃণা করে না।

গোপন করে গেছেন তার জন্মদাতা। দায়ী তিনি!

থাক। ও কথা থাক!

চাঁপা মাসীকে এসে কথাগুলি সব বলতেও হয় নি। সে কাঁদে নি। পরম আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে উজ্জ্বল হাসি হেসে বলেছিল—তাই বল মাসী মেসোমশায়কে—নার্সিং শিখতে ভরতি করে দিন আমাকে। আমি শিখব।

চার

দু বছর জুনিয়ার নার্স কোর্স ট্রেনিং। তারপর দু বছর সিনিয়র কোর্স। চার বছর। অনেক আগ্রহ অনেক প্রত্যাশা নিয়ে সে এখানে এসেছিল। আশঙ্কাও ছিল—না ছিল তা নয়। কেউই কি কোন প্রশ্ন করবে না এখানে? নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছিল—মুন সুবাসিনীর দুই মেয়েও তো পড়ে সেখানে। প্রশ্ন তো ওঠে নি। আরও জেনেছিল—সুবাসিনী এবং প্রভাত চট্টোপাধ্যায় বাস করে তার মা-বাপের মতই। চাঁপা মাসী সুরেন মেসোর মত বিয়ের রেজেস্ট্রি করার সার্টিফিকেট তারা নেয় নি। তাদের মেয়েরা যখন পড়ছে সেখানে তখন তার সম্পর্কেই বা কথা উঠবে কেন? সুরেন মেসো বলেছিল—শুধু সুবাসিনীর মেয়ে দুইটি নয়—সুবাসিনী, চাঁপা মাসী ও তার মায়ের মত আরও অনেকের মেয়েই ওখানে পড়ে পাস করে গেছে এবং আরও আট দশজন পড়ে। একবার মনে হয়েছিল—তারা যদি দীপার মত হয়! যাদের জন্ম-সত্য জানার জন্য এরকম কোন সংকোচ নেই! নিজের প্রতি নিজের ঘৃণাই যে সে সংকোচের মূল! তবুও ভরসা করে সে গিয়েছিল। ভরতিও হয়েছিল। ১৯৩৬ সাল। যুদ্ধের জন্য নার্সের অনেক চাহিদা।

সে এক নতুন জগৎ—বিচিত্র পরিবেশ।

বিস্তীর্ণ হাতার মধ্যে হাসপাতাল—নানান বিভাগ; জেনারেল ওয়ার্ড, এমার্জেন্সী ওয়ার্ড, সার্জিকেল ওয়ার্ড, কলেরা বসন্তের ওয়ার্ড। ইয়ার-নোজ-থ্রোট। মেটারনিটি।

এতদিন সে হাসপাতাল দেখেছে বাইরে থেকে। ভিতরে এসে তার আর বিস্ময়ের অবধি ছিল না। আবার অজ্ঞাত অকল্পিত এক

আশঙ্কার মুখোমুখি হয়েও চমকে উঠেছিল প্রথমটা। এ যে সবই পুরুষ—। ডাক্তার ছাত্র লোকজন সব—সবই যে পুরুষের মেলা।

হাসপাতালের বাইরে নিজেদের মধ্যে ছাত্রদের মধ্যে উল্লাস-উচ্চহাসি, ইঙ্গিত, রসিকতা,—তরুণ ডাক্তারদেরও তাই। তবে অপেক্ষাকৃত সংযত তারা। মেয়েদের অর্থাৎ নার্সরাও ঠিক তাই নিজেদের মধ্যে। কিন্তু আশ্চর্য—হাসপাতালের ভিতর ঢুকলে সব পালটে যায়। রোগ মৃত্যু—ওষুদের গন্ধ—অ্যাপ্রনের খসখসানি—নিস্তব্ধতার মধ্যে দু চারজন রোগীর কাতরানি, অন্যদের বিষণ্ণ শঙ্কাতুর দৃষ্টি—এইসবের এক প্রবল প্রভাব পড়ে সকলের উপর। সব চঞ্চলতা সব উল্লাস—সব যেন স্তম্ভিত হয়। মনে হয় অদৃশ্য কোন একজন যেন ঠোঁটের উপর তর্জনী রেখে দাঁড়িয়ে আছে, বলছে—চুপ কর।

আবার বেরিয়ে এসে খোলা হাতায় লালসুরকির পথ বেয়ে চলবার সময় সব যেন পালটায়, মানুষ সহজ হয়ে আসে। প্রথম দিনের হোস্টেলের অভিজ্ঞতা মনে পড়ছে।

সুষমা বলেছিল—কি অসভ্য ভাই ওই বোস ডাক্তারটা আর সিক্সথ ইয়ারের সেনটা। কোন জিনিস দিতে নিতে গেলেই হাত বা আঙুল টিপে দেবে নয় চিমটি কাটবে।

রেবা তার মাথায় রুমালখানা বাঁধতে বাঁধতে জবাব দিয়েছিল—তুমি ওদের বঁড়শীগাঁথা মাছের মত খেলাচ্ছ ভাই, আর ওরা সুযোগ পেলে টান দেবে না এ কি কথা? আঙুল টিপে দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছে ভাগ্যি তোমার। তোমায় কামড়ে দিতেও তো পারত! মাছ না হয়ে যদি কুমীর হত!

সুষমা মফস্বলের মেয়ে—কলকাতার কাছাকাছি আধাশহর ডায়মণ্ড-হারবারে বাপের বাড়ি। অল্পবয়সে বিধবা হয়েছিল।

সেখানে এমন কি কি ঘটেছিল যাতে সুষমাকে এ দেশের সাধারণ বিধবা মেয়েদের মতো রাখার কল্পনা তার বাপ করতে পারেন নি। অনেক ভেবে চিন্তে নার্সিং কোর্সে ভরতি করে দিয়েছিলেন। সাহায্য করেছিলেন ওখানকার একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। একটা সরকারী বৃত্তিও পাইয়ে দিয়েছিলেন। এখানকার নার্সরা বলে···সুষমা সেখানেও বঁড়শী দিয়ে গেঁথেছিল—ওই অফিসারের সদ্যযুবক পুত্রটিকে। নার্সিং শেখার সুযোগ এবং বৃত্তি তারই মূল্য। চঞ্চলা সুষমা সেবাব্রত নিয়েও বদলায় নি।

সেদিন সুষমা সঙ্গে সঙ্গে রেবাকে উত্তর দিয়েছিল—মণি আমি গাঙের ধারের মেয়ে, আমরা কি শুধু মাছ নিয়েই খেলি—কুমীর নিয়েও খেলতে পারি। গায়ে আমরা হলুদ মেখে তবে জলে নামি। ওটা কুমীরের ক্লোরোফর্ম। কুমীর কাত হয়ে যায়। আর সত্যি বলতে এরাও রুই মাছ নয়, কুমীর—তবে মেছো কুমীর—ওদের জন্যে হলুদ লাগে না—কাতুকুতু দিয়েই সারি। কুমীরের কাতুকুতু বড্ড বেশী জান তো! কথাটা শেষ করে সে হেসে প্রায় ভেঙে পড়েছিল।

রেবা শহরের মেয়ে এবং কুমারী। রঙ কালো। বাপ গরীব। বিয়ের ব্যর্থ চেষ্টা না করে তার বাপ তাকে পড়াতে চেয়েছিলেন—কিন্তু তিনবারেও ম্যাট্রিক পাস করতে পারলে না যখন তখন তার বাপ এখানে ভরতি করে দিয়েছেন! রেবা প্রথম প্রথম বড় গম্ভীর আর আড়ষ্ট ছিল—কিন্তু বিচিত্র চরিত্র—সাজতে ভালবাসত। আজও বাসে এবং সাজতেও সে জানত। এখন তো তার চর্চায় প্রায় সে সিদ্ধি-লাভ করেছে! এই কালো মেয়ে যার বিয়ে হয় নি কালো বলে তার দিকে চোখ পড়লে চোখ জুড়িয়ে যায়। নাকি—সকলে না-হলেও একদল রসিক ওর নাম দিয়েছে কালো রাধিকা। রেবা তা জানে, যখন সে ওয়ার্ড থেকে ফেরে বা ওয়ার্ডে যায়—কিংবা ডিউটির সময়েই—একটু দূর বা কোন একটি আড়াল থেকে শুনতে পায় ওই শব্দটি। প্রথম

প্রথম ওর অন্তর একটু ছলকে উঠত—হুঁচোট-খাওয়া পথিকের হাতের জলভরা ঘটের ভিতরের জলের মত। কিন্তু এখন আর ওঠে না। কারণ হুঁচোটই খায় না ও কথা শুনে। তারের উপর জলভরা ঘট মাথায় নিয়ে চলার অভ্যাস তার হয়ে গেছে। শুধু একটু মুচকে হাসে। বান্ধবীরা পরিহাস করে বলে—তুই ভাই নিষ্ঠুর। এমন মিষ্টি নাম—কালো রাধিকা বলে ডাকে—তবু সাড়া দিস নে!

রেবা বলে—জানিস নে বুঝি, গৌরী রাধা সাগরে কামনা করে স্নান করেছিল যার জন্যে বাঙলাদেশে কালো হয়ে জন্মেছে—শুধু কালো নয়, কালাও বটে। কামনা ছিল কালোকানাই ফরসা রঙ নিয়ে জন্মে বাঁশি বাজালেও যেন তা কানে না যায়। পাগল হব না আর বাঁশির সুরে! বুঝেছ!

এমন আরও অনেক মেয়ে। রেবা সুষমা তখন সিনিয়র ট্রেনিং শেষ করেছে, পাস করেছে, হাসপাতালেই কাজ করছে। ওরা তখন সব বড়র দল। সে দলের সকলেই একটা ছাঁচ পেয়েছে—শুধু ব্যক্তিগত চরিত্রের পার্থক্য অনুযায়ী পরস্পর থেকে কিছু কিছু পৃথক। সকলেরই জীবনে যেন দুটো কুঠরী হয়ে যায়, এক কুঠরী কর্মের কর্তব্যের অন্য কুঠরীটা জীবনের। এক কুঠরীতে তারা সেবিকা—মায়ের মত বোনের মত মেয়ের মত; অন্যটায় ঢুকলেই চেহারা পালটায়—তখন তারা জীবনে গৃহসুখ বঞ্চিতা—স্নেহ সম্পর্কে বঞ্চিতা—একান্তভাবে একাকিনী—জীবনের গৃহসমারোহের আনন্দক্ষেত্র থেকে নির্বাসিতার মত। তাই এই জীবনে একাকিনীরা এই নির্বাসন দ্বীপে দলবদ্ধ হলেই খানিকটা হেসে নেয়—বাঁকাপথে জীবন-বাসনার খানিকটা প্রকাশে হাল্কা হয়। দু একজন কাঁদেও।

বাসনাদি একটু বয়স্কা—পঁচিশের উপর বয়স—সে ধনুষ্টঙ্কারে বালকের মৃত্যু হলেই কাঁদত। এ কেস প্রায় আসত হাসপাতালে—এবং এলেই সে সেখানে ছুটে যেত দেখতে। বারবার খবর নিত। মৃত্যু

হলে হোস্টেলে এসে শুয়ে শুয়ে কাঁদত। বাসনাদি বিধবা হয়েছিল একটি ছেলে নিয়ে—সে ছেলে ধনুষ্টঙ্কারে মারা গেছে। বাসনাদি বড় ভাল মেয়ে ।

মুন স্থবাসিনীর মেয়েরা জুনিয়র কোর্স শেষ করেছে তখন। নীলিমা আর অনিমা। তারা খানিকটা দীপার মত। দীপার মত এতটা নয়, তবু আদল যেন আসে। গান তাদের মুখে লেগেই থাকত। চাপল্য লাস্য—তাও বেরিয়ে পড়ত বেলোয়ারী কাঁচের ছটার মত। বেলোয়ারী কাঁচ ছটা তো অহরহই ছিটকে দেয় না—ছিটকে দেয় তখনই যখন তাতে রোদের ঝলক এসে পড়ে।

ক্রশ্চান মেয়ে ছিল সংখ্যায় বেশী। তাদের ছন্দ স্বতন্ত্র। কর্মের সময় সংযম তাদের বড় সহজ ; হিন্দু মেয়েদের মত টানটা কড়া নয়। আবার কর্মের বাইরে তাদের উল্লাস—তাদের জীবনের ঝলকও একটু বেশী চড়া।

এরই মধ্যে আশ্বাসসত্ত্বেও সে আড়ষ্টভাবেই ঢুকেছিল এবং জীবনের এই বৈচিত্র্যে ওই আশ্বাসের মধ্যেও একটুখানি ভয় পেয়েছিল।

আশ্বাসের পরিমাণই বেশী। কারণ এখানে জীবনের কলঙ্ক নিয়ে জটলা নেই এমন নয় তবে তা নিয়ে জট কেউ পাকায় না। এবং সে জট ধরে টানাটানিরও প্রবৃত্তি নেই কারও। ওগুলি যেন দেহরূপের অন্তরালবর্তী রক্ত মাংস মেদ মজ্জার অস্তিত্বের মত শুধু যুক্তিতেই স্বীকৃত নয়—বোধে স্বীকৃত। এগুলির স্পর্শে ছোঁয়াচপড়া নেই। হাতই ধুতে হয়—গঙ্গাস্নান করতে হয় না।

তবু ভয় হয়েছিল।

ভয় হয়েছিল বঞ্চিত জীবনের নির্জনে কল্পনার উল্লাস দেখে! আরও ভয় হত বাইরে বেরিয়ে! অনুভব করত কত তীক্ষ্ণ বাঁকা চোখের দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ হয়েছে। তরুণ ছাত্রদের হাসি শুনে সে চমকে উঠত।—তাকে দেখে হাসছে!

তাদের নিম্নস্বরে কথা বলতে দেখলে মনে হত—তার সম্পর্কে কথা বলছে!

সে পথ চলত মাটির দিকেই মাথাটি ঈষৎ নত করে, চোখ মাটির উপরেই থাকত কিন্তু চকিতে সে দৃষ্টি তির্যক হয়ে দুই পাশে ছুটে যেত। কখনও কখনও অকস্মাৎ মনে হত পাশে কেউ দাঁড়িয়ে। চকিত তির্যক দৃষ্টিতে দেখত—হ্যাঁ ভুল দেখে নি সে। আবার কখনও দেখত—ভুলই তার সেটা। যেটার ছায়া তার উপর পড়েছে অথবা যায় অস্তিত্ব সে অনুভব করেছে সেটা মানুষ নয়—গাছ খুঁটি অথবা এমনি একটা কিছু।

ডাক্তার মেডিকেল স্টুডেন্টদের সঙ্গে চোখ তুলে কথা বলা তার সারা পাঠ্যজীবনে সম্ভবপর হয় নি। চিকিৎসার জিনিস যোগাতে গিয়ে হাত কাঁপা তার বন্ধ হয় নি। মনে পড়ে—প্রথম যেদিন ডাক্তারকে সাহায্য করবার জন্য তার ডাক পড়েছিল সেদিন তার এই কম্পনের আর সীমা ছিল না—তবু প্রাণপণে নিজেকে সামলে কাজ করেও শেষ রক্ষা করতে পারে নি। শেষকালে একটা কাচের গ্লাস দিতে গিয়ে ডাক্তার ধরবার আগেই সে সেটাকে ছেড়ে দিয়েছিল। মনে হয়েছিল—হাতে হাত ঠেকল বুঝি। গ্লাসটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। গ্লাসে শুধু জল ছিল তাই রক্ষা। তবু ডাক্তার বলেছিল—বলেছিল নয়, বিরক্তিতে বলে ফেলেছিল—ননসেন্স। ডাক্তারটি এখানকারই ছাত্র ছিল—পাস করে হাউস ফিজিসিয়ান হয়েছিল। ডাক্তার গাঙ্গুলী। বয়সে নবীনই শুধু নয়, কলেজে তার খাতির আছে!

লজ্জায় সে প্রায় মরে গিয়েছিল।

শুধু নিজের অক্ষমতা বা দুর্বলতার জন্য নয়। সে জানে—নিশ্চিতরূপে জানে—ডাক্তারের সঙ্গে তার হাত ঠেকতই এবং ডাক্তার লোহার টুকরোর মত তার হাতের চুম্বকে আকৃষ্ট এবং নিবদ্ধ হয়ে যেত। যেতই।

সে দেখেছে—চুম্বকের মত এই আকর্ষণী মুন সুবাসিনীর মেয়ে নীলিমা অনিমার আছে। তার আছে। কিন্তু সুষমা, যাকে দেখে এবং যার কথা শুনে সে প্রথম দিনই চমকে গিয়েছিল—তার ছিল না। তার বাক্যের তার ভঙ্গিমার লাস্য সত্ত্বেও না। রেবা, যাকে বলত কালো রাধিকা—তারও না।

সুষমা এখানে এখনও আছে। সে এখন এখানে চাকরি করছে। সেই হাসি—সেই কথা—সেই সব—বরং সে সব দিনে দিনে বাড়ছে—প্রখরতায় সূক্ষ্মতায় এবং শক্তিতেও। জীবনে এখন সে এখানে জলের মধ্যে মাছের মত সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছে। রেবা সেই কালো রাধিকা এখন আর এখানে নেই—আশ্চর্য কথা—সে পাস করেই যুদ্ধের চাকরি নিয়ে চলে গেছে। সুষমাকে মধ্যে মধ্যে চিঠি দিত। শেষ চিঠি পেয়েছিল রেঙ্গুন থেকে। জাপানীদের পরাজয়ের পর সেটা। একটা কথা মনে আছে—সে লিখেছিল—Life is so easy here—dear Susama, ইংরাজীতে চিঠি লিখেছিল। সুষমা বলেছিল—মরণ তোর! কিন্তু ডাক্তার যারা একটু অনুগ্রহ করত তাকে তাদের দেখিয়ে বলেছিল—দেখুন! ভাবছি আমিও চলে যাব চাকরি নিয়ে! ইজি লাইফটা দেখে আসি, চেখে আসি একটু। টাকাও নিশ্চয় অনেক পাব।

মুখে বললেও কিন্তু তা যায় নি সুষমা। নিজের কথা উল্টে দিয়ে বলেছিল—দূর, এ বেশ আছি। এখানে কেমন মায়া পড়ে গেছে।

এই সুষমাই এই গ্লাস ভাঙার ঘটনার পর বিকেলে ডেকে বলেছিল—এই মুক্তি—শোন।

হ্যাঁ—মুক্তা ওই নার্সিং পড়বার সময় মুক্তি হয়েছিল—আর বোসের বদলে হয়েছিল দাস। জাতি লিখেছিল বৈষ্ণব।

বাপের উপাধি নেবার অধিকার তার জন্মদাতা দেন নি। অর্থ

দিয়েছিলেন—এটা সে স্বীকার করে। কিন্তু কোন অন্যায়ের ক্ষতিপূরণ কি অর্থে হয়? ওটা নিতান্তই শোকে সান্ত্বনার মত। সান্ত্বনায় শোকের কারণ যেমন তেমনি থেকে যায়—কোন মতেই তা ফেরে না, এও তাই; যে ঘটনায় অন্যায় হয় সে ঘটনা ঘটে গেলে কি আর ঘটনা ঘটার আগের অবস্থায় ফেরা যায়? আর্থিক ক্ষতিপূরণে যার উপর অন্যায় হয় তার আত্মার অপমান বাড়ে।

অর্থ অবশ্য নিয়েছিল তার মা। ছেলেবেলা তার এ সব পরিচয় না জানার সময় সে অর্থে সে খেয়েছে পরেছে কিন্তু জানার পরও তো সে তা ফেলে দিতে পারে নি!

লালপাহাড়ীর কুমারের দেওয়া বাড়ির দরুন টাকাটা নিয়ে তার কোন অনুশোচনা নেই। সেখানে ছলনা নেই। কিন্তু যে জন্মদাতা তার ধার্মিক ঈশ্বরভক্ত—যিনি তার মাকে বলে গেলেন, টাকা দিয়ে গেলেন তাকে সৎ, সমাজমতে শুদ্ধা করে তৈরি করতে অথচ জন্মের মধ্য দিয়ে তাকে অশুচি অশুদ্ধই রেখে গেলেন—স্বীকৃতির সত্য-গঙ্গায় অবগাহনের অধিকার তাকে দিলেন না—তার টাকা তো সে নিয়েছিল! সেও তো ছলনা! আর উপাধি ত্যাগ? সেও তো তাই। মুক্তামালা মুক্তি নাম নিলেই কি আত্মার মুক্তি হয়? বোস দাস হলেই কি হয়? তার মধ্যে মুক্তি কামনাই বা কতটা সত্য ছিল? হিসেব করে দেখলে অতি সামান্য। ওটাও ছিল ছলনা। ওর পিছনে ছিল স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের সেই জেরার স্মৃতি।

"তোমার বাবা বোস কিন্তু তোমার মা দাসী কেন?"

তখন সে তার উত্তরই খুঁজে পায় নি। বললেই হত—মায়ের বাপেদের বাড়ি গোঁড়া ছিল—তাঁদের ঘরের মেয়েরা উপাধি ব্যবহার করতেন না। সে আমলে বামুনের মেয়েরা লিখত দেবী—কিন্তু বামুন ছাড়া সব জাতের মেয়েরা লিখত দাসী!

যাক—ও সব কথা ভেবে আজ লাভ নেই।

জীবন ভুলের বোঝা। হয়তো সবটাই ভুল। ভুল নয় মিথ্যা। সব মিথ্যা। যা সত্য ভেবে তাকে মানে মানুষ—তাই তোমাকে পিষে মারে। সেই হয় তখন শাসনকর্তা—তখন সে সত্য যদি মিথ্যাই প্রমাণিত হয় তবুও তখন তাকে অস্বীকারের উপায় নেই। তোমার নিজের মনই তখন বলে—না—না—ওই সত্য। ওকে ছেড়ে আমি বাঁচব কি করে? বাঁচতে আমি পারি না।

মানুষের একটি জাত—জাতিতে সে মানুষ।

কিন্তু তা আজও সে কোন মতেই মানতে পারছে না। তার কাছে—সত্য—'হিন্দু মুসলমান কৃশ্চান—ইংরেজ-ফরাসী-জার্মান-ভারতীয়—সাদা-কালো হলুদ'—এই মিথ্যাকে সে একদিন মেনেছিল সত্য বলে। আজ তা মিথ্যা হয়ে গেছে—বুদ্ধিতে-যুক্তিতে সবেই। কিন্তু তা তো তাকে মানতে পারছে না। সে আজও সত্যের উপরেও সত্য হয়ে আছে।

মিথ্যা জেনেও তো ওই জন্মের কলঙ্ককে আজও অস্বীকার সে করতে পারছে না। প্রতিমুহূর্তে সে অনুভব করেছে—তার কলঙ্কের আকর্ষণে মানুষের মনের প্রবৃত্তি চুম্বকের টানে লোহার মত আকৃষ্ট হচ্ছে, সে অনুভব করছে—সেই অনুভূতির ফলে তার মুখের রক্তাভায় কলঙ্ক ছোপ ফুটে উঠেছে।

সেদিনও তার তাই মনে হয়েছিল। যখন সে তরুণ হাউস ফিজিসিয়ান ডাক্তার গাঙ্গুলীকে জিনিস যুগিয়ে দিচ্ছিল তখন সে মনে মনে অনুভব করছিল যে তার আকর্ষণ চুম্বকের লোহাকে টানার মত ডাক্তারকেও টানছে। কিন্তু যতক্ষণ রোগীটি মাঝখানে ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত মাঝখানে একটি বাধা ছিল। তারপর ডাক্তার চাইল জল। কাচের গ্লাসে জল দিতে গেল সে। ডাক্তার হাত বাড়াল—সে স্পষ্ট বুঝলে এবার ডাক্তারের আঙুল দুটো তার আঙুলের উপর পড়বে, চেপে ধরবে। সে ছেড়ে দিল গ্লাসটা। মুখখানা তখন তার

কলঙ্কের আভায় লাল হয়ে উঠেছে। এ কলঙ্কই যে তার রক্তে রক্তের কলঙ্ক।

সুষমাদি বিকেলে তাই ডেকে প্রশ্ন করেছিল—এই মুক্তি শোন।

সে প্রথমটা বুঝতে পারে নি। সদ্য সে তখন ওই স্মৃতির অস্বস্তি থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। এর আগে পর্যন্ত শুধুই তার মনটা ছি-ছি করেছিল। তখন সদ্য ভাবছে—হয়েছে হয়েছে—তার জন্য এত লজ্জা কিসের? ডাক্তার তাকে নির্বোধ বোকা ভেবেছে—এ সব তো সে বুঝতে পারে নি। আর বুঝে থাকলেই বা কি? সেও তাহলে ঠিক আঙুল বাড়িয়েছিল তার আঙুলের উদ্দেশে! তাহলে সে সরিয়ে নিয়েছে ঠিকই করেছে। গ্লাসটা ভেঙেছে বেশ হয়েছে। গ্লাসের চেয়ে তার পবিত্রতার দাম নিশ্চয় বেশী। সে তাদের হোস্টেলের বারান্দার রেলিঙে কনুইয়ের ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সময়টা ফাল্গুনের শেষ; বিকেলে কলকাতার সেই সমুদ্র হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সামনে বাদাম গাছটায় পাতা ঝরছে। ভারী ভাল লাগছিল। মুহূর্তটা ছিল অস্বস্তির অবসানে স্বস্তির; তার উপর বসন্তদিনের অপরাহ্নে সমুদ্রের হাওয়ার স্পর্শে শরীরে যেন একটি আনন্দময় আরামের স্বাদ অনুভব করছিল; মধ্যে মধ্যে কোন গাছের মুকুলজাতীয় ফুলের গন্ধ ভেসে আসছিল।

সুষমাদি'র আহ্বানে সে মুখ একটু ফিরিয়ে প্রসন্ন হেসে বলেছিল—কি?

—শোন! নিচে আয়, আমি সিঁড়ি ভাঙতে পারছি না।

—যা মোটাচ্ছ দিন দিন! বলে হাসতে হাসতে নেমে গিয়েছিল সে।

—কি?

—কি? ভঙ্গি করে মিষ্টি ভাবেই ভেঙিয়েছিল সুষমাদি।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ কি? যেন কিসের একটা সন্দেহ জেগেছিল মুহূর্তে এবং ভুরুদুটি ঈষৎ কুঁচকে উঠেছিল।

—ননসেন্স! বলে হেসে ফেলেছিল সুষমাদি।

বলা এতেই সব হয়ে গিয়েছিল—মুখ তার সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় শুকিয়ে গিয়েছিল। আয়না ছিল না, বলতে পারবে না সে। কিন্তু বুকের ভিতরটায় যেন কাঁসরে কে জোরে একটা ঘা মেরেছিল—ঘং। তারপর অতি দ্রুত ঘন—ঘন—ঘন—ঘন্ বেজেই চলেছিল। তবু সে বলেছিল—তার মানে?

—মানে। ডোণ্ট মাইণ্ড ইট প্লিজ! অন্যায় হয়ে গেছে। ডাক্তার গাঙ্গুলী বলেছে রে, আমি না। মাঃ—সে কি আকুতি! যাক এতকাল পরে যেন তুই খোলস ছাড়লি! ওঃ কি জড়ভরতই না ছিলি! বলেই সে হেসে ভেঙে পড়েছিল।

সে বিরক্ত হয়ে বলেছিল—না—তুমি এমন করে হেসো না। না।

তার হাসি বেড়ে গিয়েছিল—সে বলেছিল—ও মা! ঘায়েল—দু পক্ষই! তুই মরেছিস!

—সুষমাদি!

আরও হেসে সুষমা বলেছিল—ভারী অসহ্য লাগছে, না?

সে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করেছিল—হ্যাঁ লাগছে। কারণ এ মিথ্যা। একেবারে মিথ্যা! আর আমার তোমার মত গণ্ডারের চামড়া নয়।

* * *

বীজের মধ্যে থাকে অঙ্কুর। সে অঙ্কুর যখন উদগত হয় প্রথম, তখন তাকে প্রথম ক্ষণটিতেঅন্ততঃচোখেও দেখা যায়না; শুধু বীজের দল দুটির মধ্যে দেখা যায় সুতোর মত একটি রেখা।

সেদিন সুষমার কথায় সে সজোরে প্রতিবাদ করেছিল—কিন্তু সুষমা জীবনের অভিজ্ঞতায় ওই সুতোর দাগের মত রেখার লক্ষণটি

দেখে ঠিক ধরেছিল। অঙ্কুর উদগত হয়েছে তখন। ডাক্তার গাঙুলীর সঙ্গে এর আগে থেকেই আকর্ষণ বিকর্ষণ চলছিল তার অজ্ঞাতসারে। তরুণ ডাক্তার অরুণেন্দ্র গাঙুলী—এখানে সিনিয়র ছাত্রত্ব থেকেই গম্ভীর লোক। চলায় ফেরায় তখন থেকেই সে নিজের একটা মর্যাদা গড়ে এসেছে। যার ফলে সকলে তাকে সম্ভ্রম করত। তার উপর সে সুপুরুষ। ছাত্রদের মধ্যে একটি সহজ প্রাধান্য তার ছিল, কিন্তু সে তাদের নেতৃত্ব নিয়ে নেতা সাজে নি।

সংঘের কাল। পথে ঘাটে ইনকিলাব অহরহ দীর্ঘজীবনের শুভ-কামনা লাভ করছে; এমন অবস্থাতেও ক্ষমতা থাকতেও ওই ধ্বজা সে ধরতে যায় নি। এতেই ওর মর্যাদা ছিল বেশী। কলেজের অধ্যাপকেরাও তাকে যে স্নেহ করতেন তা নিছক স্নেহ ছিল না—তার সঙ্গে সম্ভ্রমের সংমিশ্রণ ছিল। নেতৃত্ব সে করত কেবল একজায়গায়; কলেজের ছাত্রদের অভিনয়ে। সেও সেক্রেটারী হিসেবে বা অন্য কোন পদাধিকারীহিসেবে নয়—স্টেজের উপর অভিনয়ের সময় ওকেই দেখা যেত নায়ক হিসেবে। ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত তিন বছরের ছখানা নাটকের পাঁচখানাতেই মুক্তা তাকে নায়ক হিসেবে দেখেছে। 'শেষরক্ষায়' গদাই-এর ভূমিকায়—সেই বুড়ী ঝিয়ের কাছে মোজা নিয়ে বুকে চেপে ধরে—ওরে মোজা বলে জানালার পানে চেয়ে কবিতা অবৃত্তি দেখে লোকে হেসে গড়াগড়ি গিয়েছিল—কিন্তু তার মুখ চোখ কান গরম হয়ে উঠেছিল লজ্জায়, কৌতুকে সেও হেসেছিল কিন্তু তার থেকেও একটা অস্বস্তিকর লজ্জাই যেন বেশী হয়েছিল তার। কর্ণার্জুনের কর্ণের ভূমিকায় তার সে অভিনয় দেখে কেঁদেছে। দুই পুরুষে 'নুটু', মাইকেলে 'মাইকেল মধুসূদন' সবই সেই করত। শুধু কলেজেই নয়, মধ্যে মধ্যে বাইরেও অভিনয় করত সে। শনি রবিবার সপ্তাহে ফাঁক পেলেই থিয়েটারে সে যেতই। প্রথম ছাত্রজীবনে ছাত্র হিসাবেও তার সুনাম ছিল। কিন্তু শেষের দিকে এই বাতিকের

জন্যই তার সে সুনাম গিয়েছিল। অধ্যাপকেরা অনুযোগ করতেন কিন্তু ফল হয় নি। শেষ পরীক্ষায় পাস একবারেই করেছিল, কিন্তু তার মধ্যে কৃতিত্বের দীপ্তি ছিল না। তবুও তার ব্যক্তিত্বের জন্যই হোক আর অধ্যাপকদের স্নেহের জন্যই হোক—কলেজে জুনিয়ার হাউস ফিজিসিয়ান হয়ে ঢুকে অনায়াসেই সিনিয়র হয়েছিল। সেটা সদ্য সদ্য। এই ঘটনার মাত্র দিন চারেক আগে।

রূপে এবং গুণে, বিশেষ করে সাধারণ সময়ে তার গাম্ভীর্য এবং এই অভিনয়ের মধ্যে তার সর্বমুখী নায়কোচিত যোগ্যতায় সে কুমারী হৃদয়ের স্বপ্ন দেখার মানুষ ছিল এতে ভুল নেই। নইলে হয়তো সেদিন গ্লাসটা এমনি করে ভাঙত না। কল্পনার এতখানি আতিশয্য তার ঘটত না।

তরুণী নার্সদের সবাই স্বপ্ন তাকে দেখেছে। অন্ততঃ যাদের স্বপ্নদেখার মানুষ জীবনে দেখা দেয় নি তারা দেখেছে। সেও দেখেছে—এর আগে। হ্যাঁ—কতবার দেখেছে। অন্ততঃ কলেজের অভিনয়ের পর কয়েকদিন করে দেখেছে।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলা সে হাসপাতালে বেরিয়ে ওয়ার্ডের দরজার মুখে থমকে দাঁড়াল। ডিউটিতে যাচ্ছিল সে। ওপাশ থেকে ডাক্তার গাঙুলী আসছিল খুবই ব্যস্ততার সঙ্গে—সেও ওয়ার্ডে যাচ্ছে। সঙ্গে দারোয়ান। ডাক্তার গাঙুলীও থমকে দাঁড়াল—বললে, তোমার ডিউটি এখন?

সে বলেছিল—হ্যাঁ।

—কোথায়—কত নম্বরে?

—দোতলায় চার নম্বরে।

—তুমি আমার সঙ্গে এস। আমি বদল করে দিলাম ডিউটি। বলে দিচ্ছি গিয়ে।

তারা চলেছিল তেতলায়। প্রথম সিঁড়িতে পা দিয়েই ডাক্তার বলেছিল—আগে আগেই যাচ্ছিল ডাক্তার, বারেকের জন্য মুখ ফিরিয়ে বলেছিল—কালকে কথাটা আমার অভ্যাসবশে মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল। I did not mean to offend you. তুমি offended হয়েছ, না ?

সে উত্তর খুঁজছিল কিন্তু সে সময় তাকে ডাক্তার দেয় নি—বোধ হয় উত্তর চায়ও নি, বলেছিল—কুইক। কেবিনে একটা ম্যানেনজাইটিস কেস—সিরিয়স টার্ন নিয়েছে।

আবার কয়েকটা সিঁড়ি উঠে বলেছিল—নিভার পেশেন্স কম। টেম্পারটা কুইক। তোমার নেচার সফট। আর কাজ তোমার পরিষ্কার।

বলতে বলতে তারা কেবিনের দরজায় পৌঁছে গিয়েছিল। সেখানে জুনিয়র হাউস সার্জেন, স্টাফ নার্স কেবিনের মাইনে করা নার্স—এরা রোগীর দুই পাশে দাঁড়িয়েছিল—তাদের স্তব্ধতার মধ্যেই উৎকণ্ঠা যেন বেশী প্রকট হয়ে উঠেছিল। রোগী গোঙাচ্ছিল। ঘাড়টা বেঁকে গেছে।

ঘরে ঢুকেই বাস্তব জগৎ থেকে একমুহূর্তে অন্য জগতে এসে গিয়েছিল তারা।

রোগীকে মাঝখানে রেখে একপাশে তারা অন্যপাশে মৃত্যু। ঘরের বাতাসে রোগের গন্ধ ওষুদের গন্ধ। রোগীর পাশে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ডাক্তার। জুনিয়র ডাক্তার বলে যাচ্ছিল—অবস্থা।

ডাক্তার বলেছিল—এক মিনিট। তারপর স্টাফ নার্সের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—পেনিসিলিন দেব। মুক্তিকে এখানে দরকার হবে। বলে দিন আপনি। দোতলায় চার নম্বরে ডিউটি ছিল ওর। হ্যাঁ—তারপর বলো।

জুনিয়র ফিজিসিয়ান—তিনমাস আগে পাশ করেছে। সে আবার শুরু করেছিল—পাল্‌স—।

ডাক্তার গাঙ্গুলী চার্টটা হাতে নিয়ে পড়ে নিতে লাগল।

তারপর বলল—পেনিসিলিন দেব। নিয়ে এসো, যাও। আমি রইলাম। আমিই দেব ইনজেকসন। তার আগে লাম্বার পাংচার করব।

১৯৪৫ সাল।

পেনিসিলিন তখন রেফরিজারেটার ছাড়া থাকে না। দু ঘণ্টা অন্তর দিতে হয়। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় দু ঘণ্টা।

মুক্তিকে হুকুম করলে—লাম্বার পাংচারের সব ঠিক করো। দেখো কেবিনের আলমারিতে আছে বোধ হয়।

মুক্তি সাজাতে লাগল—লাম্বার পাংচার নিড্‌ল্‌, গ্লাভস, টিংচার আয়োডিন, টিংচার বেনজিন। ট্রেতে সাজিয়ে এনে রাখল টেবিলের উপর।

হাত ধুয়ে গ্লাভস তুলে নিয়ে হাতে পরতে পরতে ডাক্তার বললে —এবার ওকে বেঁকিয়ে ধর। স্টেডি! গুড।

নিপুণ হাতে সূচটা ঢুকিয়ে দিলে ডাক্তার স্পাইনাল কলামের ভিতর—জল বেরিয়ে এল—টেস্ট টিউবে জলটা ধরে সেটা দিলে কেবিনের মাইনে করা নার্সের হাতে। তার নাম নিভা।

প্রথম ইনজেকসন দিয়ে গাঙ্গুলী বললে—ঠিক সময়ে আমি আসব। সাড়ে দশটায়। তুমি এখানে স্পেশাল ডিউটিতে থাকলে। একা এর কাজ নয়।

দু ঘণ্টা অন্তর গাঙ্গুলী এসেছিল ঘড়ির কাঁটার মত।

শেষরাত্রে সাড়ে চারটেতে ইনজেকশন দিতে এসেছিল ডাক্তার। রোগী তখন শান্ত। মুক্তা নিভা দুজনেই চেয়ারে বসে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়েছে। মুক্তার কপালে একটি হাত রেখেছিল ডাক্তার। চমকে জেগে উঠেছিল সে।

স্মিত হেসে ডাক্তার বলেছিল—ইনজেকশনের সময় হয়েছে।

লজ্জিত হয়ে সে উঠে দাঁড়িয়েছিল। ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। ডাক্তার বললেন—ব্যস্ত হয়ো না। খুব ভাল ডিউটি করেছ, রোগী শান্ত হয়েছে—রোগ কমেছে; ঘুম একটু আসবেই। চোখের দোরে দাঁড়িয়ে থাকে—উৎকণ্ঠা কমলেই সেও এসে চোখের পাতায় আসন পাতে। নাও—আন সব।

ইনজেকশন দিয়ে ডাক্তার চলে যেতে যেতে বলেছিল—তুমি একটু ঘুমুতে পার এবার।

তারপর আঙুল বাড়িয়ে নিভাকে দেখিয়ে বলেছিল—এ তো সেই আড়াইটে থেকেই দেখছি ঘুমুচ্ছে। রাবিশ। তুমি বড় ক্লান্ত হয়েছ। ঘুমুচ্ছিলে—এত মায়া হচ্ছিল ডাকতে।

একটু হেসে বলেছিল—you have got a very soft face—and so sad !

কিছু বলতে পারে নি সে।

সে নার্স—ডাক্তার সিনিয়র হাউস ফিজিসিয়ান। ভয় অবশ্যই ছিল। তার সঙ্গে আরও কিছু ছিল। হ্যাঁ ছিল, ভাললাগাও ছিল। ভাল লেগেছিল তার।

অশ্বত্থমা পিটুলিগোলা জল খেয়ে দুধ খেয়েছে বলে নেচেছিল।

জীবনে তার প্রথম পুরুষের সমাদরের স্বাদ। ভাল লেগেছিল।

কিছুক্ষণ পর ডাক্তারের চাকর এসেছিল ফ্লাসক্ নিয়ে। চা পাঠিয়েছিল ডাক্তার। একটা স্লিপ পাঠিয়েছিল—চা খেয়ো। আমি খেলাম—তোমার ক্লান্ত মুখ মনে পড়ল। ভাল লাগবে। ও. কে।

খুব ভাল লেগেছিল। খুব। খুব।

একরাত্রে বীজের চারিপাশের সুতোর মত দাগটি ফেটে অঙ্কুর বেরিয়েছিল। বীজের দল দুটি তখনও পাণ্ডুর।

তার রঙ সবুজ হতে বেশী দিন লাগে নি। অল্প কয়েক দিন—বোধ হয় সাত আট দিনের মধ্যেই সবুজ হয়ে সে দুটিকে ছাড়িয়ে সবুজ দুটি পাতা দেখা দিয়েছিল। জীবনের সকল শিক্ষা সকল সংকল্প সব যেন কোনও অভিনব-উল্লাসের আবেগে নিস্তেজ হয়ে নেতিয়ে পড়েছিল—নাইট ডিউটিতে যেমন কর্তব্যবোধ সংকল্প সকলকে নিস্তেজ করে দিয়ে ঘুম আসে তেমনিভাবে। রোগী কাতরায়—কর্তব্য ডাক দেয় তবু ঘুম ভাঙলেও ছাড়ে না, তেমনি। ঠিক তেমনি।

মনে হয়—এমন কিছু নয়। আবার এখুনি ঘুমিয়ে যাবে রোগী। তেমনি ভাবেই মনে হত—মানুষের প্রতি মানুষের প্রীতি! হোক না পুরুষ! শুধু প্রীতি বই তো নয়। যে প্রীতি এমন মধুর, এত মধুর। যার স্পর্শে মনে আনন্দের স্রোত উৎসারিত হয়েছে—জীবনের শুকনো বালি ঢেকে স্রোত বইছে।

সাত দিন পর রূপী এসেছিল। দীপা থিয়েটারের টিকিট পাঠিয়েছে। দীপা থিয়েটারে নামছে। অ্যামেচার অবশ্য। কলকতায় তখন অ্যামেচার থিয়েটারে মেয়েদের নিয়ে অভিনয়ের রেওয়াজটা প্রায় সার্বজনীন হয়ে উঠেছে। দীপার মত অনেক মেয়ে এতে নামছে। সুরেন মেসো দীপাকে তৈরী করে দেয়। কলকাতায় নাম-করা অ্যামেচার পার্টি।

রূপী বলেছিল—নিশ্চয় যেন যাবি দিদি। দীপা ভাল পার্ট করবে! সত্যিই ভাল। বাবা নাচটা খুব ভাল দিয়েছে। ঠিক শিশিরবাবুর থিয়েটারের মত।

জনা-নাটক। এতে দীপা করবে মোহিনীর অভিনয়। গঙ্গার বরে অজেয় প্রবীর শুদ্ধাচারে ব্রহ্মচর্য পালন করে যুদ্ধ করেছে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের সঙ্গে। অর্জুন প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে। এরপর দেবলোক থেকে এল এক মোহিনী। বিজয়ী প্রবীর মাতৃদর্শনে চলেছিল—পথ থেকে এই মোহিনী তাকে নৃত্যগীতে হাস্যে লাস্যে

মোহিত করে নিয়ে গেল এক মায়াকাননে। সেখানে তাকে আসবপানে প্রমত্ত ক'রে তার রূপযৌবনের নৈবেদ্যে তপস্যার উপবাস ভঙ্গ করে তার সকল শক্তি হরণ করে ঘুম পাড়িয়ে দিলে। পরদিন প্রভাতে যখন প্রবীরের নিদ্রাভঙ্গ হল তখন সে সবিস্ময়ে দেখলে—কোথায় নন্দন কানন? সে শুয়ে আছে এক শ্মশানে। কই সে মোহিনী? তার পাশে রয়েছে একটি নরকঙ্কাল। হয়তো নারীকঙ্কাল।

এই মোহিনীর ভূমিকায় অভিনয় করবে দীপা। দীপা এখন ষোড়শী। মুক্তা অনেক অনেক দিন যায় নি অবশ্য। সম্পর্কটা সে ছিঁড়তেই চেয়েছিল। কিন্তু রূপী মধ্যে মধ্যে এসেছে—দেখা করেছে—সেই বলত দীপার কথা।

সে জিজ্ঞাসা করত—মাসী কেমন আছে?

—মা ভালই। তবে বাত হচ্ছে।

—মেসো?

—বাবার নেশা চেপেছে দীপাকে নিয়ে। তাকে খুব নাচ শেখাচ্ছে। ফিল্মস্টার তাকে করবেই। তা হবে, বুঝেছ না? দীপা দেখতে বড় ভাল হয়েছে। ওঃ যদি ফিগারটা তোমার মত হত! আর মুখের নরম ভাবটা পেত! মুখটা একটু কাঠ কাঠ বড্ড স্নো-টো-গুলো মাখে যে! মাঝখানে নটীর পূজায় নটীর পার্ট করলে। নাচ ভাল হয়েছিল—গান ভাল না।

—আর তুই?

—আমি? আমি কয়লা ভাঙছি। ডিপো তো আমিই চালাচ্ছি।

—তুই থিয়েটার করছিস নে?

—নাঃ। তবে সেতার শিখছি!

—সেতার!

—হ্যাঁ। নাড়া বেঁধেছি। কালিঘাটের শিবেন মাস্টারের কাছে যাই। আর একটা বিছে শিখছি। একদিন তোকে আশ্চর্য করে দেবো।

—কি বল তো!

অ্যাস্ট্রোলজি, পামিস্ট্রি! জ্যোতিষ-বিছা।

—এ সব আবার মাথায় ঢোকালে কে?

যে ঢোকাবার সেই। গ্রহ! তোর যেমন গ্রহ—তুই এসেছিস নার্সিং শিখতে। রোগীর সেবা। পূঁজ রক্ত মলমূত্র ঘেঁটে কি মাইনে? না দুটি অঙ্ক পঞ্চাশ ষাট সোত্তর পঁচাত্তর—ম্যাক্সিমাম আশী! এমন গলা! তার গলা কেটে—কি হ'ল? না—তোর প্রায়শ্চিত্তির! তুই তো প্লে-ব্যাক আর্টিস্ট হতে পারতিস।

—না।

—বেশ। না তো না। যা খুশি কর। আমি অবিশ্যি খুব অ্যাডমায়ার করি। এ তোর তপস্যা।

সেদিন টিকিট দিতে এসেও এ কথাগুলি বলেছিল রূপী। শেষকালে শুধু বলেছিল—নিশ্চয় যেন যাবি। বুঝলি? আমাকে বললে—খুব তাক লেগে যাবে তোর একটা কি দেখে। অবাক হয়ে যাবি তুই। তবে বলে নি আমাকে—কি ব্যাপার! তুই চলে যাস—কেমন? এই তো—রঙমহল! আমি বরং ফেরবার সময় তোকে পৌঁছে দেব! দীপা বারবার করে বলেছে। বাবা বলেছে—এই নাচেই দীপা ফেমাস্ হয়ে যাবে।

—যাব। হেসে বলেছিল মুক্তা।

গিয়ে সে সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিল। দীপাকে দেখে নয়! প্রবীরকে দেখে। প্রবীরের ভূমিকায়—ও কে? এ যে ডাক্তার গাঙুলী!

চমৎকার লাগছিল ডাক্তার গাঙ্গুলীকে। এবার এই সাতদিনের পরিচয়ে তাকে রাজকুমারের ভূমিকায় যে ভালটা লেগেছিল সে ভাল লাগা এর আগে তার লাগে নি। অপরূপ মনে হয়েছিল।

দীপা তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল ভিতরে। রূপী ডেকে নিয়ে গিয়েছিল।

দীপা তখন সেজেছে। রঙে-চঙে সাজ পোশাকে মানিয়েছিল ভালই। হ্যাঁ ভালই। তবে—প্রবীরকে ভোলাবার মত নয়।

আজ এতকাল পর—যখন তার গাঙ্গুলীর উপর কোন মোহ নেই, নিজে সে এতবড় নৃত্যশিল্পী—নিজের রূপে সে নিজেই মুগ্ধ এবং বহুজন মুগ্ধ; তখনও সে ঈর্ষা মোহ সব মুক্ত হয়েই বলছে—না—সেই প্রবীরকে ভোলাবার মত রূপ দীপার মধ্যে এত যত্নেও ফোটে নি। কাগজের ফুলের মত চড়া রং আর কোমলতার অভাব তাকে ম্লান করেছিল।

তবে সে দিন তার ঈর্ষা হয়েছিল। মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। নিজের উপর নিজে বিরক্ত হয়েছিল। ইচ্ছে হয়েছিল—সেও যদি আজ দীপার সঙ্গে নামত। তার ইচ্ছে হয়েছিল—প্রবীরের প্রেয়সী মদনমঞ্জরীর ভূমিকায় নিজেকে দেখতে।

রূপীই তাকে নিয়ে ভিতরে গিয়েছিল। তখন প্রথম অঙ্কের ড্রপ পড়েছে। দীপা তখনও স্টেজে বের হয় নি। তার পার্ট আরও পরে। প্রবীরকে দেখেছে এবং বিস্ময়-বোধও করেছে। খানিকটা দুঃখও অনুভব করেছে। হাঁ দুঃখই। অভিমান নয়, কারণ দুঃখ অভিমান হয়ে ওঠার মত অবস্থা হয় নি তখনও। সেই রাত্রি থেকে এই অভিনয়ের দিন পর্যন্ত রোজই তার সঙ্গে ডাক্তারের দেখা হয়েছে। রোজ। ডাক্তার যেন দাঁড়িয়ে থেকেছে তার জন্যে—হাসপাতাল ঢুকবার মুখে। একটু প্রসন্ন হাসি—দু চারটে কুশল প্রশ্ন ছাড়া কথা বলে নি। তারই মধ্যেই যেন মৃদু বর্ষণের জল-সিঞ্চনে মন

অভিষিক্ত হয়েছে—যার ফলে হৃদয়ের গোপন বীজটি ধীরে ধীরে পুষ্ট হয়েছে অঙ্কুর বিকাশের জন্য।

ভিতরে দীপা সেজে তাদের অর্থাৎ মেয়েদের সাজঘরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিল প্রতীক্ষা করে। তাকে দেখে অনেকখানি হেসে বলেছিল—চিনতে পারছ মুক্তাদি ?

চমৎকার লাগছিল দীপাকে।

মুখের রং, চোখে কাজল আঁকা ভুরু, মাথায় ফুলের মুকুট, নীচে হাতে, উপর হাতে ফুলের মালা বাজুবন্ধ—গলায় মালা পরে দীপা রূপসী হয়েছে। তার উপর সজ্জাকৌশলে তাকে তার স্বভাবের চেয়ে অনেক বেশী লাস্যময়ী মনে হচ্ছিল। দীপার কথার জবাবে সে বলেছিল—ভালো লাগছে রে !

—খুব ভালো ?

জবাবে একটু অতিরঞ্জনই করেছিল—খু—ব ভালো।

কানের কাছে মুখ এনে দীপা প্রশ্ন করেছিল—বেটা-ছেলে হলে তোর মাথা ঘুরে যেত ?

সে ভুরু কুঁচকে বলেছিল—ছি !

দীপা বলেছিল—তুই ভারী বেরসিক !

ঠিক এই সময়েই ভিতরে ওদিক থেকে এদিকে এসেছিল প্রবীরবেশী ডাক্তার! তাকে দেখেই বলেছিল—এই যে, এসেছ। যেন প্রত্যাশা করাই ছিল।

দীপা বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে প্রশ্ন করেছিল—আমার মেক্‌আপ কেমন হয়েছে ?

—ভাল ! তবে একটু বেশী হয়েছে। জান রঙকে রঙ বলে ধরা গেলেই—মানে ওটা ধরা পড়লেই তো মোহ ছুটে যায়। বলেই হেসে বললে—আমার আবার ড্রেস চেঞ্জ করতে হবে ! দিদিকে চা-টা খাওয়াও।

চমকে উঠেছিল মুক্তা। দিদি? ডাক্তার চলে যেতেই সে জিজ্ঞাসা করেছিল—তুই ওঁকে বলেছিস নাকি আমি তোর দিদি?

দীপা অসংকোচে বললে—হ্যাঁ। উনিই তো এ ক্লাবের হিরো। ওঁর খুব নাম অ্যামেচারে। শুনলাম তোদের হাসপাতালের ডাক্তার। তাই বললাম—আমার এক দিদি থাকে আপনাদের হাসপাতালে—নার্স সেখানে। জিজ্ঞাসা করলেন—কি নাম বল তো? বললাম তো বললেন—খুব চিনি। বড় ভাল মেয়ে। তোমার দিদি? কি রকম দিদি? বললাম—মাসতুত দিদি। সে প্রথম দিনই।

তার শরীরটা যেন ঝিমঝিম করে উঠেছিল। অকারণে। কারণ জীবনের পরিচয় তো সে গোপন ঠিক করে নি বা করতে চায় নি। নার্সেস কোয়ার্টারে তার পরিচয় ঠিক গোপনও তো ছিল না! কতদিন সে তাদের বান্ধবীদের মধ্যে এ আলোচনা কানাকানি হতে শুনেছে। মুন সুবাসিনীর মেয়ে দুটিই তো সে কথা প্রচার করে দিয়েছিল সে ওখানে ভরতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। তবুও শরীর ঝিমঝিম করে উঠেছিল। সে দীপাকে বলেছিল—কি দরকার ছিল বলবার?

দীপা বিস্মিত হয়ে বলেছিল—বাঃ—তাতে দোষটা কি হল?

—আমার পরিচয়ে তো তোর আলাপের সুবিধে হবে না!

—মানে?

—নার্সের বোন, তার আর দাম কি? তার থেকে—তুই আর্টিস্ট—তার খাতির তো বেশী। তার উপর উনি নিজে আর্টিস্ট!

—না—না। খুব প্রশংসা করেছিলেন তোর। বলেছিলেন—কাজ করে অন্তর দিয়ে। আর স্বভাবটি ভারী মিষ্টি। a sweet girl—

তার দেহে ঝিমঝিমিনির বিপরীত চঞ্চল প্রবাহ বেয়ে গিয়েছিল।

দীপা বলেই চলেছিল—উনিই তো বললেন—তুমি পার্ট করবে তো দিদিকে নেমন্তন্ন করবে না দেখতে? আমি বললাম—আপনিই তো এখানকার একজন কর্তা—তা কার্ড করে দিন। উনিই কার্ডের

ব্যবস্থা করে দিলেন। নইলে আমরা টাকা নেব—তার উপর কার্ড দেবে কেন? তবে বললেন—আমি নামছি তা জানিয়ো না ওকে, তা হলে হয়তো আসবে না। মানে উপরওয়ালা তো আমরা! তা না হলে তো উনিই তোকে নিয়ে আসতেন।

ঠিক এই সময়েই ফিরেছিল ডাক্তার গাঙুলী। পোশাক বদলে রণবেশে সেজে বেরুবে এবার। বুকে হাত পায়ে বর্ম—পিঠে ঢাল—তূণীর—কাঁধে ধনুক,—এ যেন আরও ভাল লাগছে। কর্ণার্জুনের কর্ণের সাজেও এমন মানায় নি। বললে—ওঃ বোনের সঙ্গে বোনের আলাপন—আনন্দমগন! খুব জমে গেছ যে তোমরা।

তারপরই বলেছিল—যাও যাও—গিয়ে সিটে ব'স গে। খুব জমবে এবার বই। বলেই এগিয়ে যেতে যেতে বলেছিল—মুক্তা, তোমার আপত্তি না থাকলে ফেরবার সময় আমি গাড়িতে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি। দীপা ওকে চা-টা খাইয়ো।

ফেরার পথে ওর গাড়িতে ফিরতে ইচ্ছে তার ছিল না। অস্বস্তি বোধ করছিল। খানিকটা দীপা তার পরিচয় দিয়েছে তার জন্য—খানিকটা তার পাশে বসে যেতে হবে তার জন্য। সেই অস্থিরতা! যার জন্য সে গ্লাসটা ছেড়ে দিয়েছিল ডাক্তার ধরবার আগেই। তার দুর্বলতা—সেটা তার রক্তে আছে। বোধ হয় মায়ের রক্তের উত্তরাধিকার। সে মনে করে—তার সান্নিধ্য—পাশের মানুষটি যদি পুরুষ হয় তবে তাকে অজ্ঞাত আকর্ষণে আকৃষ্ট করে। চুম্বকের লোহাকে আকর্ষণের মত। কিন্তু উপায় ছিল না। শেষের দিকে সুরেন মেসোর শরীরটা অসুস্থ হয়েছিল। সুরেন মেসো দীপার সঙ্গে সর্বত্রই যেতেন—টাকাটা বুঝে নিতেন তিনি বাইরে বসতেন না। ভিতরে স্টেজের লোকেদের সঙ্গে জমিয়ে বসে গল্প করতেন সে-কালের থিয়েটারের। মধ্যে মধ্যে চা—একটু আফিং আর সিগারেট।

এখানেও গল্প চোখ বুজে। বাইরে বসতেন না ওই কারণেই—দেখতে হলে চোখ খুলতে হয় যে। আর দেখবেনই বা কি এ কালের অ্যাকটিং। সে দিন তাঁর শরীর খারাপ হওয়াতেই রূপীকে তাদের সঙ্গে ফিরতে হয়েছিল। রূপী বলেছিল—তুই তো ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যাবি। আমি চলে যাই ওদের সঙ্গে!

সে 'না' বলতে উত্তর খুঁজে পায় নি।

রূপী থাকলেই বা কি হত? কি করে বলত—আমি রূপীর সঙ্গে যাব! অথবা রূপী সঙ্গে যাবে! না—তা বলতে পারত না! দুটোর একটাও না।

তার অস্বস্তি থাকলে তার সে অস্বস্তির অন্তস্থলে তার সঙ্গে যাবারও গোপন কামনা উন্মুখ হয়ে ছিল। সে কামনা সে দিন প্রবীর রাজকুমারের মৃত্যুতে শোকে বেদনায় অনুরঞ্জিত হয়ে তাকে প্রায় বিহ্বল করে তুলেছিল। নাটক শেষ হবার আগেই তাকে একজন এসে ডেকে ভিতরে নিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—ডাক্তারবাবু ভিতরে ডাকছেন।

প্রবীরের শোকে কাঁদতে কাঁদতেই সে গিয়েছিল। শেষের উজ্জ্বল দৃশ্য তার দেখা হয় নি। চুপচাপ সে বসেই ছিল। অভিনয়শেষে ডাক্তার এসে বলেছিল—পাঁচ মিনিট। রঙটা তুলে নি। কেমন!

গাড়িতে উঠে তাকে পাশেই বসিয়েছিল ডাক্তার। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে সিগারেট টানতে টানতে বলেছিল—কেমন লাগল? ডাক্তারের মুখ থেকে বিলাতী মদের গন্ধ বের হচ্ছিল।

সে বলেছিল—খুব ভাল। কিন্তু—

—কি কিন্তু?

—এ সব পার্ট কেন করেন?

—কেন?

—মরলে ভারী খারাপ লাগে!

—হাসপাতালের এত মৃত্যু দেখেও?

—হ্যাঁ।

—সে আমি দেখেছি। তোমার মুখই সফট নয়—ভিতরের ভিতরটাও। আমি জানতাম। এবং সেই জন্যেই দীপাকে তোমাকে নেমন্তন্ন করতে বলেছিলাম। নেমন্তন্নটা প্রকৃতপক্ষে আমার।

চুপ করে গিয়েছিল সে।

ডাক্তার আবার প্রশ্ন করেছিল—তুমি জানতে না—না?

মৃদুস্বরে সে বলেছিল—দীপা বলেছে।

—দীপার পার্ট ভালো হয় নি। ভালগার হয়ে গেছে খানিকটা।

সে বলেছিল এবার—দীপার সঙ্গে থিয়েটার করবেন না। ও ভাল মেয়ে নয়। নিজেই ভালগার।

হেসে ডাক্তার বলেছিল—অভিনয়ে ও বাছলে চলে না।

সে হঠাৎ বলে ফেলেছিল—থিয়েটার আপনি না করলেই পারেন। কেন করেন?

এবার ডাক্তার হেসে উঠেছিল। কিন্তু তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলেছিল—থিয়েটার না-করে আমি পারি না। তা পারলে আমি অনেক কিছু করতে পারতাম। অনেক কিছু। অন্ততঃ ডাক্তারিতে ফার্স্ট সেকেণ্ড হতে পারতাম। কিন্তু।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—অথচ ইচ্ছে হয় ছেড়ে দিয়ে বিলেত গিয়ে পড়ে আসি—রিসার্চ করি। কিছু আবিষ্কার করি। কিন্তু এর থেকে কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারি নে। কিছুতেই না।

কি উত্তর দেবে সে।

গাড়িটা হাসপাতালের রাস্তায় না-এসে-সোজা বি. টি রোড ধরেছিল। সেটা সে বুঝেও ঠিক যেন ধরতে পারে নি। ভারী ভাল লাগছিল। ডাক্তারের কথায় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল।

হঠাৎ ডাক্তার বলেছিল—কিন্তু তুমি নার্স হতে এলে কেন? কি হবে তোমার এতে? এ তো দুঃখের জীবন। এদের তো কেউ সম্মান করে না! তুমি অভিনয় করলে যে দীপার থেকে অনেক ভাল করতে।

অস্ফুট স্বরে আতঙ্কিতভাবে সে বলেছিল—না। কিন্তু সে ডাক্তারের কানে যায় নি। সে বলেই চলেছিল—শুনেছি তোমার গান গাইবার গলা খুব মিষ্টি। আর শুনেই শিখতে পার। আমি জানি, শুনেছি সব সুরেন মিত্তিরের কাছে—তুমি—

সে এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল।

ডাক্তার ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে তার পিঠে হাত রেখে বলেছিল—তুমি কাঁদছ কেন?

সে বলতে চেষ্টা করেছিল—আমি জন্মের জন্য ঘৃণত কিন্তু আমি পবিত্র হতে চেষ্টা করছি। কিন্তু বলতে পারে নি—শুধু বারকয়েক বলেছিল—আমি—আমি—আমি—।

—তুমি পবিত্র তুমি শুদ্ধ! কেন নিজেকে ছোট ভাব?

সে বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

ডাক্তার বলেছিল—তুমি কারুর চেয়ে ছোট নও।

সে এবার প্রশ্ন করেছিল—আপনি আমাকে ঘৃণা না করে পারেন?

হেসে ডাক্তার বলেছিল—ভালোবাসি, তোমাকে শ্রদ্ধা করি।

সে দিন তারা গঙ্গার ধার পর্যন্ত গিয়েছিল। বরানগরের নতুন ব্রিজ পর্যন্ত।

তাকে সে দিন গান গাইতে হয়েছিল ডাক্তারের অনুরোধে। ডাক্তার বলেছিল—ছি—ছি—ছি। এমন গলা, তুমি গান গেয়েও তো পবিত্র জীবন যাপন করতে পারতে। প্রতিষ্ঠা পেতে, অর্থ

পেতে—সুখে থাকতে! নার্সিং শিখে তুমি কি করবে? তুমি যা চাও মুক্তা তা নার্স হয়ে পাবে না। পাবে শিল্পী হয়ে। ওই তোমার মূলধন।

সে চুপ করেই বসেছিল।

অনেকক্ষণ পর ডাক্তার বলেছিল—ওঠো। বারোটা বাজে।

সে উঠে দাঁড়াতেই ডাক্তার—।

'না—' বলে চীৎকার করে উঠল বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী মুক্তামালা। সে স্মৃতিটুকু থাক, বিস্মৃতির তলে থাক, অকথিত থাক।

পাঁচ

আপনার ঘরে বসে একখানা চিঠি পড়তে পড়তে মুক্তামালা স্মরণ করছিল তার অতীত জীবন। তাকে চিঠি লিখেছেন তার সর্বাপেক্ষা হিতার্থী—তার বন্ধু—তার কর্ম ও শিল্প জীবনের সঙ্গী শ্রীনারায়ণ। বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ—বিখ্যাত যন্ত্রী। সন্ন্যাসীর মত মানুষ। বিবাহের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন।

না তাঁর নিজের সঙ্গে নয়। তিনি ব্রহ্মচারী। তিনি প্রৌঢ়। কলকাতার এক খ্যাতিমান ঘরের ছেলে—নিজে খ্যাতিমান যন্ত্রসঙ্গীতজ্ঞ, মুক্তামালার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়—সে তাকে বিবাহ করতে প্রার্থনা জানিয়েছে। সেও ব্রহ্মচারী নারায়ণের শিষ্য। দীপেন রায়। বিখ্যাত সেতারী সেও। সে জানে মুক্তামালা তাঁর কথা ঠেলতে পারবে না। সে সব জানে—মুক্তামালার জন্মকথা। সব জেনেই সে মুক্তামালাকে গ্রহণ করতে চায়। সে মুক্তমালার নাচের সঙ্গে অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করেছে।

শ্রীনারায়ণ শিষ্যটিকে বড় ভালবাসেন। তিনি অনুরোধ করেছেন —তোমার দুস্তর তপস্যার শেষ হোক মা। আমার ইচ্ছা তুমি গৃহকে বরণ করে গৃহিণী হও।

না, না হয় না। আপনি গুরু, আপনাকে আজ সব কথা জানাব। যে কথা সংসারে মাত্র কয়েকজন জানে, যা স্মরণ করতে গিয়েও আমার মুখ থেকে আমার অজ্ঞাতসারে না—না বলে একটা চীৎকার বেরিয়ে আসে, সে কথা আজ বলব আপনাকে। তারপর

আপনি বলবেন, আপনি গুরু, আপনি বিচার করে বলবেন—আমার কি কর্তব্য!

ওই চিঠি পাওয়ার একদিন পর।

সারাটা দিন-রাত্রি চিন্তা করে রূপীকে পঠিয়েছিল শ্রীনারায়ণের কাছে। তাঁকে তার ঘরে আসতে বলেছিল।

প্রৌঢ় নারায়ণ ব্রহ্মচারী মানুষ; সংগীত তাঁর জীবন-সাধনা। শিষ্য তাঁর স্বল্প কয়েক জন। প্রথম জীবনে নৃত্য-কলাও চর্চা করেছেন। কিছুদিন অধ্যাপনাও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আজন্ম-বৈরাগী মন বাঁধা পড়ে নি তাতে। সন্ন্যাসী হয়ে যান। পায়ে হেঁটে ভারতবর্ষ ঘুরেছেন। তাতেও ঠিক তৃপ্তি পান নি। ফিরে এসে লোকসমাজের একান্তে একটি নির্জন স্থান খুঁজে সেখানে এই সংগীতচর্চা নিয়েই ছিলেন। কিন্তু তাঁর সুরধ্বনির অমৃতস্পর্শ বায়ুতে বহন করে লোকসমাজে নিয়ে গেছে। লোক-সমাজ তাঁর কাছে ছুটে এসেছে। তাঁর নিজের শুধু একটি খেয়াল ছিল—সেটি হল এই যে, বৎসরে একবার তিনি ভারত পরিক্রমা করে—অমরনাথ থেকে কন্যাকুমারী—দ্বারাবতী থেকে কামাখ্যা পর্যন্ত তীর্থগুলিতে একবার তীর্থেশ্বরদের অঙ্গনে বসে গান শুনিয়ে আসতেন। শুধু দেবতা নয়, ভারতবর্ষের পুণ্যতোয়া নদ-নদীকেও গান শোনাতেন। সে অভ্যাস আজও রেখেছেন। দ্বারকায় ভগবানের মন্দিরে গান শুনিয়ে সমুদ্রতটে যান—যন্ত্রসংগীত শোনান—পুরীতেও তাই—জগন্নাথদেবের অঙ্গনে গান সেরে সমুদ্রকে গান শোনান। বারাণসীতে বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণাকে সংগীতে বন্দনা করে দশাশ্বমেধঘাটে যান—গঙ্গাকে গান শোনান। কামাখ্যায় নীলপর্বতে কামাখ্যা-দেবীকে গান শুনিয়ে ব্রহ্মপুত্রের তটভূমিতে বসেন—সেতার নিয়ে ঝংকার তোলেন। এখানেও শেষ নয়; এই বিচিত্র মানুষটি যত মহৎ মানুষ আছেন—ছিলেন—তাঁদেরও গান শোনাতে যান—এবং যেতেন। শান্তি-নিকেতন গেছেন কবিগুরুকে

গান শোনাতে—ওয়ার্ধা গেছেন—সবরমতী গেছেন—মহাত্মাজী যখন মহাপ্রয়াণের পূর্বে দিল্লীতে ছিলেন সেখানেও গেছেন। তাঁকে ভজন শুনিয়ে এসেছেন। আক্ষেপ করেন—নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে শোনাতে পারেন নি। ভারতের মুখ্যমন্ত্রী জহরলালের কাছে আজও যান নি—বলেন—তাঁর সময় কোথায়। সময় হোক তখন যদি বেঁচে থাকি যাব।

বিচিত্রভাবে মুক্তার সঙ্গে তাঁর পরিচয়।

এখানে নয়, বিদেশে। চীনে।

মুক্তামালাও তখন থেকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে এই গুরুর শিষ্যা হয়ে পরস্পরের কাছে বাঁধা পড়েছে।

মুক্তামালার ঘরে আসনের উপর বসেছেন। পরনে সাদা থান—গায়ে আংরাখা, তার উপর উত্তরীয়—গলায় সোনার তারে গাঁথা রুদ্রাক্ষ; মাথার চুল ধবধবে সাদা; দাড়ি-গোঁফ রাখেন না—পরিচ্ছন্নভাবে কামানো; সমস্ত কিছুর মধ্যে পরিচ্ছন্নতা তার শুভ্রতার মধ্য দিয়ে যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মুখের হাসিটি মিষ্ট—কপালে একটি হোমতিলক।

মুক্তা বললে—আমি অপরাধী। আমার জীবন সব আপনার কাছে আজও খুলে বলতে পারি নি। আজ বলব। আপনি জানেন আমার জন্ম পরিচয়। আমি গোপন করি নি।

নারায়ণ বললেন—মা, তুমি পবিত্র। জন্মের কোন কলঙ্ক তোমায় স্পর্শ করেনি। জন্মের কলঙ্ক কোথায় স্পর্শ করে জান মা? করে যেখানে জন্মের জন্যই কর্মও মানুষের কলঙ্কিত হয় সেইখানে। তুমি তো মা তপস্বিনীর মত শুদ্ধ। এ কি মা কাঁদছ কেন?

চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এসেছিল তার। একটু চুপ করে বোধ করি আত্মসম্বরণ করে সে বললে—বলেছি তো আপনার কাছে তা আমি গোপন করেছি। পারি নি বলতে। আমার জন্মে নয়—। আবার তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

আবার আত্মসম্বরণ করে বললে—।

আপনি জানেন—আমি জীবনে একা। না। আমি একা নই। আমি মা। আমার সন্তান আছে।

চকিত হয়ে একবার তাকালেন শ্রীনারায়ণ। বললেন—বল মা বল!

মুক্তামালা বললে—সে দিন ডাক্তারের কাছ থেকে নিজেকে সজোরে মুক্ত করে নিয়েছিলাম। শুধু বলেছিলাম—না—না—না

তার কারণ এই নয় যে বিবাহ না-করা পর্যন্ত তাকে আমায় স্পর্শ করতে দেব না। বিবাহের দাবি কামনাই আমার ছিল না। বিবাহেই ছিল আমার ভয়। আমার জন্মকলঙ্ক বিবাহ সত্ত্বেও আমার সন্তানকে স্পর্শ করবে। আমার নিজের সম্পর্কে ভয় ছিল—আমার রক্তে আছে দেহবিলাসবাসনা। যা জাগলে আমার সর্বদেহে মহিষের দেহজ্বালা—যা পাঁকে আকণ্ঠ ডুবেও যেমন মহিষের মেটে না—তেমনি একটা জ্বালা আমাকে এমনি পাঁকে ডুবতে বাধ্য করবে।

ডাক্তার হেসে ছেড়েই দিয়েছিল আমাকে সেদিন। বলেছিল—excuse me—ভুল হয়ে গেছে। চল ফিরে যাই। বিশ্বাস কর আমাকে।

আবার সে চুপ করে গেল।

নারায়ণ বললেন—থাক মা—

বাধা দিয়ে মুক্তা বললে—না থাকবে না। বলব, বলতেই হবে আমাকে। অপরাধ শুধু তার তো নয়—আমারও। এই ভয়, এই প্রতিবাদ আমার সত্য কিন্তু তাকে কামনাও তো আমার ছিল। আমার তপস্যা—হ্যাঁ নার্স হতে গিয়েছিলাম—এই তপস্যার জন্যে এ যুগে অন্যের কাছে তপস্যা কথাটা হাস্যকর মনে হবে—আপনার হবে না।

—সে তো আমি চিঠিতে লিখেছি—কতবার বলি এ তোমার তপস্যা।

হাসলে মুক্তা।

বললে—জানেন আমি নিজেই একদিন নিজেকে বিশ্লেষণ করে এর ব্যাখ্যা করেছি—এ আমার কমপ্লেক্স। মনের বিকৃতির জটিলতা বাল্যে আমার মাকে দেখেছি ভগবানকে ডাকতে, তাঁর নিজের যে অতীত জীবন তার রূপ ছিল মহাজনটুলিতে—তাকে তিনি পাপ বলতেন। আমার জন্মের সত্যকে সযত্নে গোপন রেখেছিলেন, আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন—এ পাপ। নিজে জানতাম না নিজের পরিচয় মিথ্যায় ছিল ঢাকা—সেই মিথ্যার উপর বসতি বেঁধে আমার সত্য পরিচয়কে করেছিলাম ঘৃণা। তাই যে দিন সত্য প্রকাশিত হল—মা বললেন নিজের মুখে—সে দিন নিজেকে নিজেই দিলাম দণ্ড; পাতিত্য নিজেই চাপিয়ে নিলাম নিজের মাথায়। শ্মশানঘাটে আমার পরিচয়ে সেখানকার লোকের বাঁকা হাসি একটা বাঁকা ছোরার মত আমার মনের মুখে ঠিক কপালে দাগ টেনে দিয়েছিল। তারপর থেকে অন্য যে কেউ আমার দিকে তাকিয়েছে তার চোখের আয়নায় আমি যেন আমার মনের মুখের কপালের এই দাগ দেখেছি। ইস্কুলে গায়ত্রী আর হেডমিস্ট্রেস আমার সেই দেখাকে সত্য করে তুলেছিল। তারা উঁচু গলায় প্রকাশ করে বলেছিল—তোমার কপালে দাগ—কপালে দাগ। ভয়ে ঘরে ঢুকলাম। মনে হল আমি পাপ—আমার মধ্যে পাপের বাসা। মায়ের শিক্ষা—ইস্কুলের শিক্ষা আমাকে বললে—পবিত্রতার তপস্যা কর, জীবনটাকে শুদ্ধ কর, বঞ্চনা কর নিজেকে। গানে ছিল সহজ অধিকার, জন্মগত অধিকার, নাচেও ছিল—প্রথমটা অবশ্য জানতাম না। জন্ম থেকে পাওয়া বলে গান অনিবার্য আকর্ষণে টেনেছে—তবু গান গাই নি, গাইতে চাই নি, শিখতে চাই নি। ভয় হত—গান যা জন্মগুণে পেয়েছি সে নিশ্চয় আমাকে নিয়ে যাবে ওই পঙ্কতৃষ্ণায়।

একটু থামলে মুক্তা। তার কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ জড়তামুক্ত হয়ে পরিষ্কার হয়ে এসেছে এখন। সে মুখ তুলেছে। কথা বলছে

গুরুর মুখের দিকে তাকিয়ে অসংকোচে। থেমেছে সে একটু বিশ্রামের জন্য।

গুরু তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন হেসে বললেন—বিশ্লেষণ তো তোমার মিথ্যা নয় মা। সংসারে পাপ কখন সত্য ভেবে দেখ! পাপকে পাঁকের সঙ্গে তুলনা করলে, পাঁকের একটা পীড়া আছে, কিন্তু পাঁক থেকে উঠে স্নান যখনই কর তখনই তো মানুষ তা থেকে মুক্ত। সে পীড়া তো থাকে না—থাকবার কথা নয়! স্নান করার পরেও যদি সে পীড়া কেউ মনে অনুভব করে তবে সেটা তো মানসিক বিকৃতিই বটে।

একটু থেমে আবার বললেন—আরও একটা অবস্থায় পাপের পীড়া থাকে না, যখন পাঁকের মধ্যে থেকে থেকে ওই পীড়াটা সইবার ক্ষমতা জন্মে যায়, তখন আর মানুষ মানুষ থাকে না—তখন ওই মহিষই হয়ে যায়।

মুক্তা বললে—এমন সহজ ভাবে সোজা সামনে তাকিয়ে এই কথাগুলো তখন মনে আসে নি। মনে এসেছিল বাঁকা ভাবে। পাপ পুণ্য অস্বীকার করে, সংসার সমাজ সব কিছুর উপর মর্মান্তিক আক্রোশে—ঘৃণায়।

ঘৃণা আক্রোশ এনে দিল জীবনে—ওই ডাক্তার।

*　　　*　　　*

—"সেদিন প্রতিবাদ করতেই সে আমাকে ছেড়ে দিয়েছিল, মাফ্ চেয়েছিল। হাসপাতালে ফিরে এসে নামিয়ে দিয়ে আবার বলেছিল—Please forget and forgive me.

এত রাত্রেও সুষমাদি জেগেছিল—সুষমাদি একা নয়—আরও পাঁচ সাত জন। ওরা নিত্যই এমনি জেগে আড্ডা দিত—জীবনের এই রসপানের নেশায় মাতলামি করত যতক্ষণ না দেহ ভেঙে পড়ত ঘুমে ততক্ষণ।

আমাকে দেখেই তারা খুব হুল্লোড় করেছিল—বুঝতেই পারছেন।

কিন্তু আমি রূঢ়স্বরে বলেছিলাম—সুষমাদি! কারণ আমি পবিত্র দেহ নিয়েই ফিরে এসেছিলাম।

তাতে সুষমাদিও থমকে গিয়েছিল। কিন্তু একমুহূর্ত পরেই সে সমান রূঢ় ভাবে প্রশ্ন করেছিল—রাত্রি সাড়ে বারোটায় ডাক্তারের গাড়িতে তার পাশে বসে ফিরে এলি কোত্থেকে শুনি? সতী শিরোমণি আমার!

একমুহূর্তে মিথ্যে কৈফিয়ৎ এসে গেল। বললাম—থিয়েটারে সুরেন মেসো এসেছিল দীপাকে নিয়ে—সেখানে মেসোর হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। ডাক্তারবাবুদের থিয়েটার—ডাক্তারবাবু পার্ট করছিলেন—তিনি তাঁকে দেখে ইনজেকশন দিয়ে নিজের গাড়িতে তাদের বাড়িতে দিয়ে এলেন। আমি সঙ্গে গিয়েছিলাম সঙ্গে এসেছি।

থমকে গেল ওরা। আমি নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। শুয়ে শুয়ে কাঁদলাম।

প্রতারণা সে দিন তাদের করতে গিয়ে করলাম নিজেকে। সত্য কথাটা বলতে পারলাম না। দেহে তাকে পেতে—তাকে কেন কাউকে পেতেই আমার ভয় ছিল—কিন্তু মন আমার—আমার সেই যৌবনদিনে একজনকে চেয়েছিল বই কি। এ চাওয়া এ চাহিদা যে প্রকৃতির চাওয়া। আমার মন তাকেই চেয়েছিল। তারই জন্যে সে দিন শুয়ে শুয়ে আমি কেঁদেছিলাম। আজ বুঝতে পারছি—আপনার কাছে বলছি—সে আমাকে চেয়েছিল সে দিন—আমি তাকে নিজেকে দিতে পারি নি—সেই ক্ষোভে সেই বেদনায় আমি কেঁদেছিলাম। পরের দিনও কেঁদেছিলাম। কয়েকদিন দূরে দূরে সরেও থাকলাম। কিন্তু কয়েকদিনের পর আর পারলাম না।

একদিন হাসপাতালে ডাক্তার এল রাউণ্ডে। আমি ছিলাম—

আমার কর্তব্য সব দেখানো—দেখাচ্ছিলাম। কিন্তু বুকের ভিতরটায় দুরন্ত আবেগ বর্ষার মেঘের মত অকস্মাৎ ছুটে এসে সব ছেয়ে ফেলে গুরু গুরু করে দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম আমার হাত পা কাঁপছে।

যখন সে বেরিয়ে গেল তখন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে বললাম—আমাকে ক্ষমা করুন আপনি। খুব করুণ কণ্ঠে বলেছিলাম। কানে আজও আমার সে দীন কণ্ঠস্বর শুনতে পাই।

তিনি মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে চলে গেলেন।

ক্ষমা সেই হাসির মধ্যেই ছিল।

বুকের মধ্যে আমার তাকে পাবার কামনা তখন জেগেছে শেষরাত্রির ঘুমের মত। কর্তব্যবোধ মমতাবোধ সব কিছুর আকুতি প্রেরণাকে ছাপিয়ে ছেলের শিয়রে জেগে থাকা মাও যেমন ঘুমে কাতর হয়—ঢুলে ঢুলে শেষে ঘুমিয়ে পড়ে—তেমনি করে জাগছিল আমার এই কামনা। এর সঙ্গে তার সমাদর মৃদু বাতাসের স্পর্শের মত আমার সে ঘুমকে গাঢ়তর করছিল। আমার তপস্যা শিথিল হল। ঘুমিয়ে পড়লাম।

গুরু বললেন—থাক মা—

—না। শুনুন। দোষ সে লোকটির নিঃসন্দেহে—সে অপরাধী। তবু সে বিচিত্র মানুষ। এবং আমার মন—এও হয়তো বিচিত্র। না শুনলে বুঝবেন না। সে লোকটি আমার এ ঘুমের সুযোগ ঠিক নেয় নি। সে আমার সঙ্গে বন্ধুর মতই ব্যবহার করে যাচ্ছিল। আর বাড়ছিল তার থিয়েটারের নেশা। থিয়েটারের নেশাতেই চাকরি ছেড়ে প্র্যাকটিসের উপর নির্ভর করে চেম্বার খুলে বসল। আমি চেম্বারে যেতাম। চেম্বারে দীপা আসত। দীপা দিনে দিনে খ্যাতি অর্জন করে বিখ্যাত হয়ে উঠছে। সিনেমাতে ছোটখাটো পার্ট

পেয়েছে। অ্যামেচারে নায়িকা হচ্ছে। ডাক্তারের কাছে আসত বসে থাকত। হাসত। গাঙ্গুলী ওদের বিনা পয়সায় দেখত।

বাজারে গুজব রটল—ডাক্তার প্র্যাকটিস ছেড়ে সিনেমা করবে। থিয়েটারেও নামবে। শুনলাম হাসপাতালে। সে দিন চেম্বারে গিয়ে আমি বললাম—না। এ করবেন না। না। আমি দেব না এ করতে।

তখনও আমি তাকে আপনি বলি।

সে বললে—না এ মিথ্যে কথা। থিয়েটারের নেশার চেয়ে ডাক্তারিতে অনুরাগ আমার কম নয়। ওসব বাজে কথায় বিশ্বাস করো না। কিন্তু ও হাসপাতালে ভাল লাগছিল না। তার অনেক কারণ। ওখানে আমার জীবনের সুযোগ নেই। সুযোগ যে দিন আসবে সে দিন থিয়েটারও ছেড়ে দেব। তুমি কি আমাকে আজও চিনলে না!

চুপ করে রইলাম। অস্বীকারের উপায় তো ছিল না।

সে বললে—কি তোমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি গালব?

মাথাটা সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়ে দিতে, বললে—গাললাম—। ডাক্তারি ছেড়ে সিনেমা করব না। হল তো?

মাথাটা না-সরিয়েই বললাম—না। আর একটা—

—সেটা কি?

—দীপার সঙ্গে থিয়েটার করবেন না!

—দীপার সঙ্গে?

—হ্যাঁ।

—বেশ। তুমি তা হলে নাম অভিনয়ে। আমি নায়ক তুমি নায়িকা। বল!

সেই মুহূর্তে সব ভেসে গিয়েছিল আমার। বলেছিলাম—হ্যাঁ। সেই দিন অঘটন ঘটল। আমার মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে ঠোঁটের

উপর সে ঠোঁট রাখল। আমি আপত্তি তো করলামই না, চাইলাম এই ভাবেই থাকি কিছুক্ষণ। ডাক্তার আমাকে একটু ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হেসে বললে—oh sorry—I forgot myself—take it easy.

অভিনয়ে নামলাম। এ পারঙ্গমতা আমার জীবনে ছিল। দেহ বোধ হয় আমার নাচের ছন্দেই গড়া—কণ্ঠে স্বর আমার সুরে বাঁধা—নাম করতে দেরি হল না। দু তিন বারেই নাম হল। চাকরি সেই ছাড়ালে। বললে—ও তোমার জন্য নয়।

মাস তিনেকের মধ্যে ঘটে গেল।

আরও ঘটল। দীপা বাড়ি থেকে পালাল। চাঁপা মাসীর স্ট্রোক হয়ে প্যারালিসিস হল। সুরেন মেসো, রূপী দীপাকে ফেরাতে গেল—সে ফিরল না। যার সঙ্গে সে পালিয়েছিল সে সিনেমায় একটা কিসের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। সে আসতে দেয় নি। দীপাও চায় নি। তার ধারণা হওয়ার কারণ ছিল যে তার বাপ তার মা তার উপার্জন কেড়ে নিচ্ছে। তা নিত তারা। থিয়েটারের সিনেমার টাকা তারাই নিত হাত পেতে। এবং দিত না তাকে। চাঁপা মাসী গৃহস্থ হয়েও ও স্বভাবটুকু ছাড়তে পারে নি। ডাক্তারই চাঁপা মাসীকে দেখত—সেই দীপার সঙ্গে অভিনয়ের সূত্র থেকে। সে বলেছিল—মুক্তাকে বাড়ি আনুন সুরেনবাবু। ওকে ছুটি নেওয়াচ্ছি। এই বইটায় যদি ভাল পার্ট করে তবে চাকরি ছাড়িয়ে দেব। ও বাড়ি থাকলে দেখাশোনার সুবিধে হবে।

ছুটি নিয়ে সে বাড়ি এল। হাতে পার্ট। বড় পার্ট।

ডাক্তার নতুন থিয়েটার গ্রুপ করেছে। ছোট বই। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা। ২৭শে বৈশাখ প্রথম। তারপর কয়েকদিন নানান প্যাণ্ডেলে। ডাক্তার অর্জুন—সে চিত্রাঙ্গদা। নাটক আর নৃত্যনাট্য মিশিয়ে করবার ঝোঁক হয়েছে ডাক্তারের। সুরেন মেসোকে

বলেছিল—ওর নাচটা আপনাকে ঠিক করে দিতে হবে। আমরা আমাদের গ্রুপ থেকে ফি দেব আপনাকে।

চাঁপা মাসী সুস্থ থাকলে হয়তো চীৎকার করত। চীৎকার দীপার জন্য। কিন্তু তার কথা জড়িয়ে গিয়েছিল—বোধশক্তিও বেশ ভাল ছিল না।

ডাক্তার তাকে বলেছিল—আমার মুখ রাখতে হবে।

ডাক্তারই একটা গ্রামোফোন এবং চিত্রাঙ্গদার গানের সব রেকর্ড কিনে দিয়েছিল।

—"আমারও তখন নেশা লেগেছে। রক্তে যেন জোয়ার ধরেছে। পৃথিবী ভুলেছি—দিন ভুলেছি—রাত ভুলেছি। গান গুঞ্জন করছি—

রোদন ভরা এ বসন্ত

কখনও আসেনি বুঝি আগে।

কখনও গাই—তৃষ্ণার শান্তি সুন্দর কান্তি—

তুমি এসো—বিরহের সন্তাপ ভঞ্জন!

বক্তৃতা করি—পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে

সে নহি—নহি—

অবহেলা করি রাখিবে পিছে

সে নহি—নহি।

স্বপ্নও দেখতাম অভিনয়ের।

তারপর হল অভিনয়। সেও স্বপ্নের মত। আত্মহারা হয়ে অভিনয় করেছিলাম। অভিনয়ে নৃত্যে গানে আশ্চর্য শক্তি দেখিয়ে-ছিলাম আমি। কিন্তু আমার মনে নেই।

মনে আছে—অভিনয়ের শেষে কখন সে আমাকে তার ফ্ল্যাটে নিয়ে গেছে। আমি বিহ্বল হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছি। বুকে আকণ্ঠ তৃষ্ণা—আকুল আগ্রহে সর্ব দেহ শিরাস্নায়ু থরথর করে কাঁপছে।

তবে মুখে বলছি—না না—না। তুমি তো তেমন নও। তুমি বৈজ্ঞানিক। তুমি যুক্তিবাদী, তুমি—

সে বলেছিল—আমিও আজ আপনাকে হারিয়েছি মুক্তা। তুমিও হারিয়েছ। আমি দেখতে পাচ্ছি।

বলেছিলাম—কি হবে ভাবো তো? না না।

সে বলেছিল—জীবন অঙ্ক নয় মুক্তা। জান এক আর একে যোগ করলে দুই হয়। কিন্তু জীবনে একটি পুরুষ একটি নারীর যোগফল সাধারণতঃ এক। নিরেনব্বুই ক্ষেত্রে এক। কখনও কখনও দুই হয় সে তিনও হয় চারও হয়। জীবন অঙ্কে চলে না। বিদ্যায় চলে না। বুদ্ধিতে চলে না—জীবন চলে আপন ছন্দে। বলে সে আমাকে বুকে তুলে নিয়েছিল।

আমি হারালাম, ডুবে গেলাম।

* * * *

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সে। স্থির নির্বাক। দু চোখের কোণে দুটি ফোঁটা জল ছোট দুটি মুক্তার দানার মত টলমল করছিল।

প্রতিমার মত মনে হচ্ছিল তাকে। মুখের ভাবে কি ছিল নির্ণয় করা কঠিন। বেদনা? না, ক্ষোভ? না; —হয়তো অপরিসীম ঔদাসীন্য।

নারায়ণ ডাকলে—মা।

প্রতিমার মুখে কথা ফুটল। সে বলতে লাগল—আমি মা হলাম। মাস তিনেক যেতে যেতেই অনুভব করতে পারলাম। ছুটে গেলাম তার কাছে। কি হবে? সে একটু চুপ করে থেকে বললে —অত্যন্ত সহজভাবে নিতে পার না?

চমকে উঠলাম।

সে বললে—তোমাকে কোন হোমে রেখে দেব। সন্তান হলে তাকে অনাথ আশ্রমে দেব—

আবার চমকে উঠলাম—কি বলছ তুমি ?

—ঠিক বলছি। ভাল আশ্রমে রাখব। টাকাপয়সা দেব—

—না। চীৎকার করে উঠলাম—

—কিন্তু—অন্য পথে বিপদ আছে—

—হে ভগবান্! বলে এবার চীৎকার করে উঠেছিলাম। তারপর বলেছিলাম—না—না। তা দেব না। সে হতে দেব না আমি।

—তবে ?

উত্তর দিতে পারি নি আমি।

সেই বলেছিল—তা হলে বিয়ের কথা বলছ ? কিন্তু তা তো হয় না। বিবাহ তো আমি করব না। আমি বিবাহের উপযুক্ত নই। না—নই। আমি আমাকে জানি। তা ছাড়া তোমাকে বলি নি—আমি ইউরোপ চলে যাচ্ছি। আমেরিকান বন্ধু আছে আমার—তারা সাহায্য করছে। সে তো হয় না!

প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল। আমি তাকে অপমান করেছিলাম—সে কথা বলে নি। শুধু বলেছিল—এ যুগে এত অবুঝ হচ্ছ কেন তুমি ?

নিরুপায় হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি এসেছিলাম। বাড়িতে তখন লোক বসে আছে—আমায় পার্ট দিতে এসেছে। অনেক টাকা দেবে। আমার খ্যাতি রটে গেছে, আমি বিখ্যাত হয়ে গেছি।

* * *

সেই তার সঙ্গে শেষ দেখা।

চলে যাবার সময় কিন্তু সে একটি মাতৃসদনে আমার থাকবার ব্যবস্থা করে গিয়েছিল।

সেখানেই হয়েছিল আমার সন্তান। পুত্র। তার জন্যও সে টাকা দিয়ে গিয়েছিল একটি সম্ভ্রান্ত আশ্রমে।

আমি প্রথম সন্তানকে ছাড়তে রাজী হই নি। কিন্তু শেষে

ছেড়েছিলাম—নিজের প্রতি ঘৃণায় লজ্জায়। কি বলব আমি তাকে যখন সে বড় হবে ?

তারপর জীবনে এল সাফল্য। একের পর এক।

আমি একা, আমি নিঃস্ব আমি রিক্ত। চাঁপা মাসী মারা গেছে, সুরেন মেসো মারা গেছে, দীপার অনেক দুঃখ-দুর্দশা। তিনবার বিয়ে করেছে।

আমি নানান দলে নাচলাম। আমাকে বিদেশে নিয়ে গেল। চীনে আপনার সঙ্গে দেখা হল। আমি অবাক হলাম। মনটা জুড়োল। আপনাকে জড়িয়ে ধরলাম। কিন্তু এই সত্যটি বলতে পারি নি আপনাকে। ছেলের জন্যই আমি মরতে পারি নি। আমার জীবনশুদ্ধি হল না। হেরে গেছি আমি। প্রতিষ্ঠা নিয়ে আছি—সম্পদ নিয়ে আছি। আর আছি ছেলের জন্য। তার টাকা সেই অনাথ আশ্রমেই পড়ে আছে। আমার টাকাতেই সে এখন পড়ছে। রূপী যায়—তাকে দেখে আসে। সে তাকে চেনে—সে তার মামা। আমিও যাই—দেখে আসি। দূর সম্পর্কের মাসী বলেই আমাকে জানে। সিনেমাতে নামি নি ছেলের জন্যে। সে দেখবে আমার নগ্নরূপ।

নারায়ণের চোখ থেকে এবার জলের ধারা নেমে এসেছিল।

সেই দেখে চুপ করলে মুক্তামালা।

একটু পর বললে—আর একটু আছে। কিছুদিন আগে সে একখানা পত্র লিখেছিল কালিফোর্নিয়া থেকে—সেখানে এখন সে বড় ডাক্তার হয়েছে।

লিখেছিল—জীবনে আবার তার মোড় ফিরছে। সে ওখানকার রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটে বড় একটা কিছু করবার প্রত্যাশা রাখে। লিখেছে—আশা করি এতদিনে তুমি এটা সহজভাবে নিতে পেরেছ। Take it easy,—মহাভারত পড়েছ ? ব্যাসের জন্মকথা ব্যাস